হে ইতিহাস গল্প বলো

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা - ৭

প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই ভাদ্র,
১৮৮৩ শকাব্দ

টা. ১·৭৫
নঃ পঃ

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

শ্রীঅমল মিত্র
স্নেহাস্পদেষু

ভূমিকা

সম্পূর্ণরূপে ইতিহাসকে অবলম্বন ক'রে এই কাহিনীগুলি লিখিত হয়েছে। সুতরাং এগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে একাধারে চিত্তাকর্ষক গল্প এবং নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য। ইতি

হেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রথম বাঙালী সম্রাট

শিরোনামা প'ড়ে তোমাদের অনেকেই হয়তো অবাক হবে। বাঙালী সম্রাট আবার কে?

এমন বিস্ময় নয় অহেতুক। প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্ত বাঙালীদের আভিজাত্য স্বীকার তো করত না বটেই, উপরন্তু তাদের মনে করত অনেকটা হরিজনেরই সামিল। বলত, বাংলা হচ্ছে পাখীর দেশ, ওখানে গেলে জাত যায়।

ইংরেজরা শিখিয়েছে, বাঙালী হচ্ছে ভীরু, কাপুরুষ; ইস্কুলের ছেলেদের পড়িয়েছে, পুরানো বাংলার বীরত্বের বড়াই করবার কিছুই নেই, প্রভৃতি।

হালের ভারতে অবাঙালীদের মুখেও শুনি ঐ ধরণের বুলি। অল্প-দিন আগেও ভারতের গুজরাটী উপ-প্রধানমন্ত্রী মুখ ফুটে বলতে লজ্জা পান নি,—বাঙালী খালি কাঁদতেই জানে! ভদ্রলোক বেবাক ভুলে গিয়েছিলেন যে, ভারতে মুসলমানদের দাসত্ব সর্ব্বপ্রথমে স্বীকার করে সিন্ধুর সঙ্গে গুজরাটই এবং তাঁর জীবনকালেই বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়েছেন সুভাষ, বাঘা যতীন, কানাই ও ক্ষুদীরাম প্রমুখ আগুনের দূতের দল।

এইসব কুৎসার হট্টগোলে হঠাৎ বাঙালী সম্রাটের নাম করলে প্রথমটা চমকে যেতে হয় বৈকি!

কিন্তু কেবল একজন নন, বাঙালী সম্রাট ছিলেন একাধিক। তবে আজ আমি যাঁর কথা বলব, লিখিত ইতিহাসে তিনিই হচ্ছেন সর্ব্বপ্রথম। তাঁর নাম শশাঙ্ক। বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁকে সম্রাট্ বলেই পরিচিত করেছেন।

কিন্তু জনসাধারণ তাঁর কথা ভালো করে জানে না কেন ?

এ জিজ্ঞাসার জবাব হচ্ছে, কোন কবি বা প্রাচীন লেখক বিশেষ ভাবে তাঁর পক্ষ গ্রহণ করেন নি বলে।

বিশাখ দত্ত লিখিত "মুদ্রারাক্ষস" নাটকে ও গ্রীক পর্য্যটক মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় পাই ভারতবর্ষের প্রথম সম্রাট মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের কাহিনী। প্রথম চৈনিক পর্য্যটক ফা-হিয়েন লিখে রেখে গেছেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের কাহিনী।

বাণভট্টের "হর্ষচরিতে" এবং চৈনিক পর্য্যটক হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে পাই সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের কাহিনী।

কহ্লন প্রমুখ লেখকদের "রাজতরঙ্গিণী" গ্রন্থে অমর হয়ে আছে কাশ্মীরের অনেক রাজার কাহিনী।

কত বড় দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ! তাঁরও জীবনী সেদিন পর্য্যন্ত ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দৈবগতিকে অল্প কিছু জানা গিয়েছে, তাও তাঁর সভাকবি হরিষেণের লিপি আবিষ্কারের পর।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সম্রাট শশাঙ্কদেব তেমন সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। নইলে তিনিও আজ ইতিহাসে কোণঠাসা না হয়ে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন ও ললিতাদিত্য প্রভৃতির মতই প্রখ্যাত হতে পারতেন।

গৌণভাবে কেউ কেউ তাঁর উল্লেখ করে গিয়েছেন। কোথাও কোথাও তাঁর মুদ্রা বা শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এবং এদিকে ওদিকে ছড়ানো ভাবে পাওয়া গেছে আরো কিছু টুকরো টুকরো নজির।

বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকরা ঐ অপ্রচুর মালমশলার ভিতর থেকেই শশাঙ্কের যে অসম্পূর্ণ আখ্যান আবিষ্কার করেছেন, তার সাহায্যেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি তাঁর অপূর্ব্ব মহাপুরুষত্ব। ঐ আবিষ্কার-কার্য্য এখনো চলছে, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আমরা প্রায়-পরিপূর্ণ শশাঙ্ককে দেখবার সুযোগ পাব।

আপাততঃ যেটুকু পেয়েছি তাই নিয়েই আমাদের তুষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু এর মধ্যেও গণ্ডগোল ও তর্কাতর্কির অভাব নেই। ভিনসেণ্ট স্মিথ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, রাধাগোবিন্দ বসাক, রমেশচন্দ্র মজুমদার, কে. পি. জসওয়াল ও ডি. সি. গাঙ্গুলী প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের সৃষ্ট তর্কজালের মধ্যে পড়ুয়াদের জড়িয়ে ফেলবার ইচ্ছা আমাদের নেই। তাঁদের কাছ থেকে সহজ বুদ্ধিতে যেটুকু গ্রহণযোগ্য সেইটুকু নিয়েই এই প্রথম বাঙালী সম্রাটকে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে চাই।

দুই

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদ।

অধঃপতিত গুপ্তসাম্রাজ্য! ধূলায় লুণ্ঠিত সম্রাটের শাসনদণ্ড! ভারতবর্ষ তখন অরাজক নয়, "সহস্ররাজক"! সাম্রাজ্যকে খান্ খান্ করে ফেলে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছেন ছোট ছোট রাজারা।

বাংলাদেশের যে অংশ আগে গৌড় (এখনকার উত্তরবঙ্গ) বলে বিখ্যাত ছিল, সেখানে রাজত্ব করতেন শশাঙ্ক নামে এক নরপতি। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল কর্ণসুবর্ণপুর। আধুনিক মুর্শিদাবাদের বহরমপুর সহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছয় মাইল দূরে আছে রাঙামাটি নামে গ্রাম। সেইখানেই ছিল প্রাচীন কর্ণসুবর্ণপুরের অবস্থান।

একখানি সেকেলে শিলালিপি (অর্থাৎ পাথরের উপরে খোদা লিখন) পাওয়া গিয়াছে। তার উপরে লেখা ছিল—"শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেবস্য"। সামন্ত বলে অধীন রাজাকে। মহাসামন্ত অধিকতর বড় রাজা হলেও স্বাধীন নৃপতি নন।

অতএব বুঝতে পারি প্রথম জীবনে শশাঙ্কদেব স্বাধীন ছিলেন না। তাঁরও চেয়ে একজন বড় বা মহা রাজার অধীনে রাজত্ব করতেন। কিন্তু তিনি কে?

ঐতিহাসিকদের অনুমান, তাঁর নাম মহাসেনগুপ্ত। বিক্রমাদিত্যের প্রথমপুত্র কুমারগুপ্ত পিতার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের সিংহাসন পেয়েছিলেন এবং তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের নাম গোবিন্দগুপ্ত। কালক্রমে গুপ্তসাম্রাজ্য লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় এবং কুমারগুপ্তের বংশ লোপ পায়। সেই সময়ে ছোট তরফের অর্থাৎ গোবিন্দগুপ্তের বংশধররা মগধ ও গৌড় প্রভৃতি দেশের মহারাজা নামে আখ্যাত হন। মহাসেনগুপ্ত সেই বংশেরই সন্তান। এসব কথা এখনো যথা-যথভাবে প্রমাণিত হয় নি, কেবল এইটুকু নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহাসেনগুপ্তই ছিলেন মগধের অধিপতি। সেইজন্যেই শশাঙ্ককে তাঁরই সামন্ত বলে আন্দাজ করা হয়েছে।

তারপর প্রশ্ন উঠে, শশাঙ্কদেব কে? কেমন করে তিনি গৌড়ের সিংহাসন পেলেন? তাঁর পিতৃপরিচয় কি?

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, শশাঙ্কদেব ছিলেন ছোট তরফের গুপ্তবংশীয়দেরই একজন এবং মহাসেনগুপ্তের পুত্র। এটা মেনে নিলে শশাঙ্কের মগধাধিকারের পক্ষে একটা সুযুক্তি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকরা ঐ মত মানতে রাজি নন। আসল কথা, শশাঙ্কের পুর্ব্বপুরুষদের কথা এখনো নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। তবে প্রবাদে বলে, পুরুষ ধন্য হয় স্বনামেই, অতএব তাঁর বংশপরিচয় না পেলেও আমাদের চলবে।

ঐতিহাসিক বলছেন: "শশাঙ্ক কামরূপ ব্যতীত সমগ্র উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের অধীশ্বর ছিলেন।" উত্তর-পূর্ব্ব ভারত বলতে সমগ্র বঙ্গ ও

বিহার (বা মগধ) প্রদেশ বুঝায়। উড়িষ্যাতেও শশাঙ্কের সামন্তরাজা ছিলেন, তাঁর নাম মাধববর্ম্মা।

সুতরাং শশাঙ্ককে হঠাৎ দেখি কেবল গৌড়ের সামন্তরাজার রূপে নয়, উত্তর-পূর্ব্ব ভারতব্যাপী বিশাল এক সাম্রাজ্যের স্বাধীন সম্রাট রূপে। কেমন করে এটা সম্ভবপর হল ?

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদে উত্তর-ভারতকে পড়তে হয়েছিল বিষম সব অশান্তির আবর্ত্তে। তারই ফলে যে শশাঙ্কের ভাগ্যপরিবর্ত্তন হয়েছিল, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। দেখা যাক্, সেই সব অশান্তির কারণ কি ?

প্রথমতঃ, মধ্যপ্রদেশের কালাচুরি বংশীয় এক রাজার হস্তে মগধ-গৌড়ের অধিপতি মহাসেনগুপ্তের শোচনীয় পরাজয়। তারপর মহাসেন-গুপ্তের আর কোন কথা জানা যায় না, সম্ভবতঃ তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ, তিব্বতের শক্তিশালী রাজা স্রং সান্-এর প্রবল আক্রমণে ছোট তরফের গুপ্তদের রাজ্য লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয়তঃ, দাক্ষিণাত্যের চালুক্যবংশীয় রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মণ দাবি করেন, তিনি নাকি যুদ্ধে জয়ী হয়ে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধের উপর অধিকার বিস্তার করেছিলেন।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে যোগ্য নায়কের অভাবে উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল ভয়াবহ বিপ্লবের তরঙ্গের পর তরঙ্গ।

এমনি সব বিপ্লবের সময়েই উদ্যোগী পুরুষরা পান আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ। দৃষ্টান্ত দিতে গেলে ফরাসী বিপ্লবের কথা তুলতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে ফরাসী দেশে তুমুল বিপ্লব না বাধলে পুরুষসিংহ হয়েও নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সম্রাট হবার সুযোগ লাভ করতেন না।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, শশাঙ্কও ছিলেন পুরুষসিংহ। তিনি কেবল

তেজস্বী, সাহসী ও কর্ম্মঠ নন, সেই সঙ্গে ছিলেন সুচতুর, সুকৌশলী ও সুবুদ্ধি এবং রাজনীতিতে পরম অভিজ্ঞ। উপরন্তু তরবারি ধারণ করতেন না দুর্ব্বল অপটু হস্তে।

দৃপ্তকণ্ঠে তিনি বললেন, "বিদেশী শত্রুদের হানায় সোনার বাংলা ছারখারে যেতে বসেছে—এ দৃশ্য সহ্য করা অসম্ভব! ক্ষুদ্র গৌড়ের পঙ্গু সামন্ত রাজার তুচ্ছ মুকুট প'রে আর আমি তুষ্ট ও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব না, আমি হব অদ্বিতীয়, আমি হব স্বাধীন—স্বদেশে স্থাপন করব স্বরাজ্য!"

শশাঙ্কের মুখে প্রেরণাবাণী শুনে জাগ্রত হল সমগ্র গৌড়বঙ্গদেশ, উদ্বোধিত হ'ল বাঙালীজাতির আত্মা, কোষমুক্ত হল হাজার হাজার শাণিত করবাল!

তারপরেই দেখি অতীত ও বর্ত্তমানের মাঝখানে নেমে এসেছে এক দুর্ভেদ্য, অন্ধ যবনিকা। সেই যবনিকা সরিয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিকরাও এখনো পর্য্যন্ত বিশেষ কোন দৃশ্য দেখতে পান নি—আমরা কিন্তু কান পেতে শুনতে পাই রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের গগনভেদী রণকোলাহল, বঙ্গবীরদের সিংহগর্জ্জন, পলাতক শত্রুদের আর্ত্তনাদ!

তারপর যবনিকার ফাঁক দিয়ে কোনক্রমে দৃষ্টি চালিয়ে ঐতিহাসিকরা সবিস্ময়ে দেখলেন কোন কোন উজ্জ্বল দৃশ্য!

উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের সিংহাসনে সগৌরবে অধিষ্ঠিত প্রবল পরাক্রান্ত স্বাধীন সম্রাট শশাঙ্কদেব, চারণকবিরা রচনা করছেন তাঁর নামে কুলকীর্ত্তিগীতি এবং নিখিল বঙ্গের বাসিন্দারা দেশ ও জাতির মুক্তিদাতা বলে তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করছে সশ্রদ্ধ প্রণতি!

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধের উপরে সগর্ব্বে উড়ছে তখন প্রথম বাঙালী সম্রাট শশাঙ্কের বিজয় পতাকা।

"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন", এ হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্য।

তিন

কিন্তু শশাঙ্কের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এইখানেই হ'ল না পরিতৃপ্ত। সমগ্র উত্তরাপথে তিনি চালনা করতে চাইলেন নিজের বিজয়ী বাহিনীকে।

কেবল যে নিজের সাম্রাজ্যের আয়তনবৃদ্ধির জন্যেই শশাঙ্কদেব এই নূতন অভিযানে নিযুক্ত হয়েছিলেন, এমন কথা মনে হয় না। তিনি কেবল যোদ্ধা নন, রাজনীতিবিদ্‌ও ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব্ব দিক—তাঁর সাম্রাজ্যের দুই দিকেই ছিল পরম শত্রু—তাঁকে আক্রমণ করবার জন্যে তারা ছিল সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

নিষ্কণ্টক হবার জন্যেই শশাঙ্কের এই নূতন যুদ্ধযাত্রা। আধুনিক যুদ্ধনীতি ও রাজনীতিতেও বলে, শত্রুর স্বরাজ্যে গিয়েই শত্রুকে আক্রমণ করা উচিত। শশাঙ্কদেবও সেই নীতি অবলম্বন করতে চাইলেন।

এইখানে আরো কোন কোন পাত্র-পাত্রীর একটু একটু পরিচয় দিলে পরের ঘটনাগুলো বোঝবার সুবিধা হ'বে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে (আধুনিক পাঞ্জাব প্রদেশে) ছিল শক্তিশালী স্থানেশ্বর রাজ্য—তার রাজা ছিলেন প্রভাকরবর্দ্ধন, তাঁর বড় ছেলের নাম রাজ্যবর্দ্ধন এবং তাঁর ছোট ছেলে ও ছোট মেয়ের নাম যথাক্রমে হর্ষবর্দ্ধন ও রাজ্যশ্রী। কনোজের রাজা গ্রহবর্ম্মণের সঙ্গে রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়েছিল।

কনোজের গ্রহবর্ম্মণ ছিলেন মৌখরী বংশের রাজা। ঐ বংশের রাজারা বরাবর মগধ ও গৌড়ের সঙ্গে শত্রুতা করে এসেছেন। তাঁরা বার বার চেয়েছেন মগধ ও গৌড় অধিকার করতে। অতএব এই চিরশত্রুদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেওয়া, শশাঙ্কদেব একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলেই গণ্য করলেন। শত্রুকে আগে আক্রমণ করবার সুযোগ

না দিয়ে তিনিই আগে আক্রমণ করতে চাইলেন শত্রুকে। এ হচ্ছে রণনীতি।

সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব দিকে ছিল কামরূপ (আধুনিক আসাম প্রদেশ) রাজ্য। তার রাজার নাম ভাস্করবর্ম্মণ। ঐতিহাসিকরা বলেন, খুব সম্ভব শশাঙ্ক সম্মুখ যুদ্ধে তাঁকে হারিয়ে দিয়েছিলেন বলে তিনিও মনে মনে শত্রুতা পোষণ করে প্রতিশোধ নেবার জন্য সুযোগ খুঁজছিলেন।

এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে শশাঙ্কদেব সসৈন্য বেরিয়ে পড়লেন। তাঁকে যে যুদ্ধ করতে করতে অগ্রসর হ'তে হয়েছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে-সব যুদ্ধের কোন বর্ণনা আর পাওয়া যায় না।

তাঁর বিজয়যাত্রা বিস্তৃত হয়ে পড়ল কাশীধাম পর্য্যন্ত। মুর্শিদাবাদ থেকে বারাণসী, দূরত্বও যথেষ্ট এবং এতখানি জায়গা দখল করাও যা তা শক্তির পরিচায়ক নয়। তারপর এই পর্য্যন্ত এসে তিনি নিজের ভূয়োদর্শনের আর-একটা মস্ত প্রমাণ দিলেন।

তিনি বুঝলেন মৌখরী রাজা গ্রহবর্ম্মণ হচ্ছেন স্থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের জামাই। সুতরাং তাঁকে আক্রমণ করলে তাঁর সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবে স্থানেশ্বরের সৈন্যগণও। নিজের রাজ্য ছেড়ে অত দূরে গিয়ে একসঙ্গে দুই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।

মধ্যভারতে ছিল মালব প্রদেশ, সেখানকার রাজার নাম দেবগুপ্ত, তিনি গুপ্তবংশীয়। গুপ্তসাম্রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ পাবার পরেও ভারতের এখানে ওখানে সেই বংশের কোন কোন প্রাদেশিক নৃপতি রাজত্ব করতেন। দেবগুপ্তও সেইরকম একজন রাজা এবং মৌখরিরা ছিল গুপ্তদেরও চিরশত্রু।

দেবগুপ্তকে শশাঙ্ক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্যে আহ্বান করলেন এবং দেবগুপ্তও সাগ্রহে দিলেন সেই আহ্বানে সাড়া।

তারপর খবর এল স্থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্দ্ধন পরলোকে গমন করেছেন। এত বড় সুযোগ ছাড়া উচিত নয় বুঝে দেবগুপ্তের কাছে দূতমুখে শশাঙ্ক বলে পাঠালেনঃ "আপনি মৌখরিরাজ গ্রহবর্ম্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করুন। আপনাকে সাহায্য করবার জন্যে আমিও সদলবলে যাত্রা করছি।"

দেবগুপ্ত অবিলম্বে মৌখরিদের রাজ্য আক্রমণ করলেন।

চার

তারপর উপরি-উপরি ঘটল ঘটনার পর ঘটনা।

মালবরাজের সঙ্গে যুদ্ধ হ'ল মৌখরিরাজের এবং যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হলেন গ্রহবর্ম্মণ। দেবগুপ্ত মৌখরিরাজের সহধর্ম্মিণী ও স্থানেশ্বরের রাজকন্যা রাজ্যশ্রীকে বন্দিনী ক'রে শত্রুদের রাজধানী কনোজ অধিকার করলেন।

যুবরাজ রাজ্যবর্দ্ধন তখন রাজা হয়ে স্থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। নিজের ভগ্নীপতির মৃত্যু ও সহোদরার বন্দিদশার কথা শুনে তিনি একটুও সময় নষ্ট করলেন না। দেব-গুপ্তের সঙ্গে শশাঙ্ক যোগ দেবার আগেই তাড়াতাড়ি দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করে ঝড়ের মত কনোজের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সে প্রবল আক্রমণ সহ্য করতে পারলেন না দেবগুপ্ত।

স্থানেশ্বরের তরুণ রাজা যে এত শীঘ্র যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে পারবেন, শশাঙ্ক নিশ্চয়ই সেটা আন্দাজ করেন নি। তিনি যখন

সসৈন্যে ঘটনাক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন, দেবগুপ্ত তখন পরাজিত ও নিহত।

সদ্য সদ্য যুদ্ধজয়ী হয়ে তখন রাজ্যবর্দ্ধনের সাহস গিয়েছে বেড়ে। প্রাজ্ঞতার পরিবর্ত্তে তিনি দেখালেন অজ্ঞতা। আরো সৈন্যবলের জন্য অপেক্ষা না করেই তিনি শশাঙ্কের মত অভিজ্ঞ যোদ্ধাকে আক্রমণ করতে ইতস্ততঃ করলেন না, ফলে তিনিও যুদ্ধে হেরে বন্দী ও নিহত হলেন।

স্থানেশ্বরের রাজকন্যা ও কনোজের রাণী রাজ্যশ্রী এই গোলযোগের সময়ে কেমন করে কারামুক্ত হলেন তা জানা যায় না। তিনি পালিয়ে গেলেন বিন্ধ্যারণ্যের দিকে। শশাঙ্কের উদ্দেশ্য সিদ্ধ—চূর্ণ হল চিরশত্রু মৌখরিদের দর্প! সুদূর গৌড় থেকে বেরিয়ে তিনি আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় প্রান্তদেশে এসে রোপণ করেছেন নিজের গৌরবনিশান!

ওদিক থেকে সংবাদ এল, স্থানেশ্বরের রাজপুত্র বা নূতন রাজা হর্ষবর্দ্ধন বিপুল এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে আসছেন।

এদিকে আবার কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মণও শশাঙ্কদেবের অবর্ত্তমানে সাহস পেয়ে হর্ষবর্দ্ধনের পক্ষে যোগ দিয়ে সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব সীমান্তে উপদ্রব আরম্ভ করেছেন।

দুই দিকে প্রবল শত্রু দেখে বিচক্ষণ নায়কের মত শশাঙ্ক আবার স্বদেশের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। কিন্তু তার আগে নিহত ও পরাজিত মৌখরিরাজের ছোট ভাই অবন্তীবর্ম্মণকে কনোজের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন—নিশ্চয়ই নিজের সামন্তরাজা রূপে।

হর্ষবর্দ্ধন প্রথমে বিন্ধ্যারণ্যে যাত্রা করলেন। কারণ তিনি খবর পেয়েছিলেন, তাঁর সহোদরা রাজ্যশ্রী নাকি সেখানকার আদিবাসীদের আশ্রয়ে বাস করছেন। তিনি যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে রাজ্যশ্রী জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ

চিতায় প্রবেশ করে জীবন দেবার উদ্যোগ করছেন

করে জীবন দেবার উদ্যোগ করছেন। ভগ্নীকে উদ্ধার করে তিনি ধাবিত হলেন শশাঙ্কের সন্ধানে। এসব হচ্ছে সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদের ঘটনা।

তারপরের ঘটনা স্পষ্ট ক'রে জানা যায় না। শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষবর্দ্ধনের কোথাও সম্মুখযুদ্ধ হয়ে থাকলেও তার কোন সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে এটা ঠিক, শশাঙ্কের গতি কেউ রোধ করতে পারে নি, তিনি নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, শশাঙ্কদেব পলায়ন করেন নি, সুব্যবস্থিতভাবে সমগ্র ফৌজ নিয়ে পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়েছিলেন। এই বিংশ শতাব্দীতেও বৃহত্তর বাহিনীর সম্মুখীন হলে বড় বড় সেনাপতিরা ঠিক ঐ পদ্ধতিই অবলম্বন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রুশিয়ানরা প্রথমে হটে গিয়েছিল বলেই পরে জার্ম্মানদের একেবারে হারিয়ে দিতে পেরেছিল। শশাঙ্কদেবেরও এই চাতুর্য্যপূর্ণ যুদ্ধকৌশল ব্যর্থ হয়নি, কারণ পরে তাঁর রাজ্যে গিয়ে হর্ষবর্দ্ধন হয়তো অল্পবিস্তর উৎপাত করেছিলেন, কিন্তু মগধ ও বঙ্গদেশ জয় বা শশাঙ্ককে বন্দী না করেই সে যাত্রা তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল স্বদেশে।

নিজের সাম্রাজ্যে স্বাধীন সম্রাট শশাঙ্কদেব স্বয়ংপ্রভু হয়েই সগৌরবে বিরাজ করতে লাগলেন।

পাঁচ

হর্ষবর্দ্ধন যখন "মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষ" ব'লে নিজের নামসই করতেন, তখনও শশাঙ্কদেব মাথা নত ক'রে তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন নি। শ্রীহর্ষের সঙ্গে সজ্ঘর্ষের পরে বহু বৎসর পর্য্যন্ত তিনি

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে নিজের রাজ্যচালনা করে গিয়েছেন। একদিকে হর্ষবর্দ্ধন এবং আর-একদিকে কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মণ, দুই দিকে দুই পরাক্রান্ত শত্রু, কিন্তু কেহই মগধ ও বাংলাদেশের সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমি অধিকার বা শশাঙ্কের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করতে পারেন নি। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, তাঁদের কারুরই শশাঙ্কদেবকে দমন করবার শক্তি ছিল না।

হর্ষবর্দ্ধন কবি বাণভট্টের পালক ও অন্নদাতা ছিলেন। তাঁর প্রতিপালকের শত্রু বলে বাণভট্টও শশাঙ্কদেবকে বাছাবাছা গালাগালি দিয়েছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগও করেছেন। একটি অভিযোগ এই: শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারী।

পৃথিবীর সব দেশেই সেকালকার রাজনীতিতে বিধি ছিল, পরাজিত শত্রুকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করা। অধিকাংশ স্থলেই সেই নীতি পালিত হ'ত এবং আজও হয়। গত দ্বিতীয় মহাসমরে জয়ী হয়ে মিত্রপক্ষ বিচারের নামে জার্ম্মানীর বন্দী রণনায়কদের নিয়ে কি নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, সে কথা সর্ব্বজনবিদিত। শশাঙ্কদেব রাজনীতিই পালন করেছিলেন এবং রাজনীতি চিরদিনই নিষ্করুণ।

হর্ষবর্দ্ধন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেন নি, কিন্তু তিনি ছিলেন বৌদ্ধদের পৃষ্ঠপোষক এবং এইজন্যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চৈনিক ভ্রমণকারী হিউয়েন সাঙ সর্ব্বত্রই তাঁর গুণগান ও তাঁর শত্রুদের দোষকীর্ত্তন করে গিয়েছেন। তিনি বলেন, শৈব শশাঙ্ক ছিলেন বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচারী ও বৌদ্ধ-কীর্ত্তি ধ্বংসকারী। কিন্তু ঐতিহাসিকরা বলেন, এর কারণ শশাঙ্কের ধর্ম্মদ্বেষিতা নয়, মগধে ও গৌড়ে যে সব বৌদ্ধ বাস করতেন, তাঁরা দেশের মহাশত্রু হর্ষবর্দ্ধনের অনুগত ছিলেন ব'লেই শশাঙ্কের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

বাণভট্ট ও হিউয়েন সাঙের অভিযোগ অমূলক বা অতিরঞ্জিত বলেই গ্রহণ করা হয়।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সমগ্র উত্তর-পূর্ব্ব ভারত যে সম্রাট শশাঙ্কের অপূর্ব্ব প্রতিভায় ও প্রবল প্রতাপে গৌরবোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের কারণ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনো তাঁর সম্বন্ধে আরো বেশী কিছু আবিষ্কৃত হয় নি।

তাঁর মৃত্যুর তারিখও সঠিকভাবে বলা চলে না। তবে তিনি যে ৬১৯ খৃষ্টাব্দের পরেও জীবিত ছিলেন, এ কথা নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে। খুব সম্ভব ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের কিছু আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন।

শশাঙ্কের বলিষ্ঠ মুষ্টি থেকে রাজদণ্ড খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যের মধ্যে হ'ল বহিঃশত্রুর আবির্ভাব। পূর্ব্বদিক থেকে হানা দিলেন কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মণ এবং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে হানা দিয়ে আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন সমগ্র মগধ ও বঙ্গদেশ দখল করে বসলেন। শশাঙ্কদেব বর্ত্তমান থাকতে এমন সাহস বা ক্ষমতা তাঁদের কারুরই হয় নি। শশাঙ্কের শক্তি ও বীরত্বের এও একটা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

তখনকার মত বাঙালীর গৌরব বিলুপ্ত হ'ল বটে, কিন্তু অষ্টম শতাব্দীতে পুনর্ব্বার বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল নবজাগ্রত বাঙালীর অমিত বাহুবল—তবে সে হচ্ছে ভিন্ন কাহিনী।

সম্রাট শশাঙ্কের এক পুত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর নাম মানব। কিন্তু তিনি অযোগ্য পুত্র, পিতার মত মহামানব হতে পারেন নি, রাজ্যশাসন করতে পেরেছিলেন মাত্র আট মাস পাঁচ দিন।

অনামা বীরাঙ্গনা

দিল্লীর প্রথম আফগান সুলতান হচ্ছেন লোদী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বহ্‌লল। ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসন অধিকার করেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত প্রথম পানিপথের যুদ্ধে বাবরের কাছে পরাজিত হবার পর আফগানরা আর কখনো ভারতের উপরে কর্ত্তৃত্ব করতে পারে নি।

বহ্‌লল জীবনে অনেক যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়েছেন, কিন্তু সে সবের কথা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমরা এখানে একটি বিশেষ যুদ্ধের কাহিনী বলতে চাই। ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসে এরকম কাহিনী দুর্লভ। "তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফগান" নামক গ্রন্থ থেকে কাহিনীটি সংগৃহীত।

সিন্ধু প্রদেশে আহম্মদ খাঁ ভাট্টি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, তিনি আর মূলতানের শাসনকর্ত্তার হুকুম তামিল করতে রাজী নন। তিনি গঠন করেছেন এক বৃহৎ সেনাদল এবং তার মধ্যে অশ্বারোহী সৈনিকের সংখ্যা বিশ হাজারের কম নয়। এই ফৌজ নিয়ে তিনি মূলতানের যত্রতত্র হানা দিয়ে বেড়ান—কোথাও লুঠতরাজ করেন, কোথাও কোন সহর দখল করেন। দিনে দিনে বেড়ে উঠছে তাঁর শক্তি ও সাহস। জীবনযাপন করেন তিনি স্বাধীন নৃপতির মত।

দিল্লীতে গিয়ে পৌঁছল এই দুঃসংবাদ। সুলতান বহ্‌ললের বুঝতে বিলম্ব হল না যে, অবিলম্বে এই বিদ্রোহ দমন করতে না পারলে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াবে রীতিমত গুরুতর।

দিল্লী থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়িয়ে পড়ল সুলতানের ত্রিশ হাজার

সুশিক্ষিত সাদী-সৈনিক, তাদের পুরোভাগে রইলেন সেনাপতি উমর খাঁ ও রাজপুত্র বেয়াজিদ।

কিন্তু খবর শুনে আহম্মদ খাঁয়ের মুখ শুকিয়ে গেল না, আত্মশক্তির উপরে তাঁর অটল বিশ্বাস। সব দিক তলিয়ে না বুঝে তিনি অস্ত্রধারণ করেন নি। সুলতানের ফৌজকে উত্তপ্ত অভ্যর্থনা দেবার জন্যে তিনিও প্রস্তুত হতে লাগলেন।

সুলতানের মত তিনিও স্বশরীরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন না। সেনাপতি করলেন নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র নওরং খাঁকে এবং সুলতানের ত্রিশ হাজার অশ্বারোহীর বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন মাত্র পনের হাজার অশ্বারোহী। নিশ্চয়ই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, তাঁর এক একজন লোক শক্তিতে দু'জন শত্রুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

নওরং খাঁ বয়সে নবীন, বীরধর্ম্ম পালনের চেয়ে আমোদ-আহ্লাদের দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। প্রথমেই নিজের তরবারি কোষমুক্ত করবার ইচ্ছা তাঁর হ'ল না।

দাউদ খাঁ নামে এক সেনানীকে ডেকে বললেন, "দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তুমি শত্রুদের মুণ্ডপাত করে এস। দরকার হলে আমি সাহায্য করব।"

ত্রিশ হাজারের বিরুদ্ধে দশ হাজার! কথাটা শুনতেও হাস্যকর। কিন্তু দাউদ খাঁ মুখে কোন প্রতিবাদ করলেন না, সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন যথাসময়ে।

যুদ্ধ হল। ত্রিশ হাজার তরবারিকে জবাব দেবার চেষ্টা করলে দশ হাজার তরবারি। কিন্তু পারবে কেন? জয়ী হল সুলতানের পক্ষ। রক্তাক্ত মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল দাউদ খাঁর মৃতদেহ। মারা পড়ল বা জখম হল তাঁর অনেক সৈন্য। বাকী সবাই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এল।

ছুটে গেল নওরং খাঁর আমোদ-আহ্লাদের স্বপ্ন। কেমন করে তিনি

আর পিতৃব্যের কাছে মুখ দেখাবেন? বিলাসের আসন ছেড়ে নেমে এসে তিনি সজ্জিত হতে লাগলেন রণসজ্জায়।

এখন তিনি মরিয়া। নেই তাঁর মৃত্যু-ভীতি। তিনি প্রমাণিত করতে চান, তাঁরও ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে বীরের রক্ত, যোদ্ধার রক্ত।

তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন এক নারী। ইতিহাস তাঁর প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছে। কিন্তু আকৃতির কথা বলে নি। তাঁর নামও আমরা শুনি নি। কেবল এইটুকু জানতে পেরেছি, তিনি ছিলেন নওরং খাঁর প্রিয় বান্ধবী। বর্ণনার সুবিধার জন্যে আমরাও তাঁকে বান্ধবী বলে ডাকব।

বান্ধবী বললেন, "বন্ধু, আমিও তোমার সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চাই।"

নওরং খাঁয়ের আপত্তি হ'ল না। সেকালকার অনেক রাজা-বাদশা নারীদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করতেন।

পরাজিত সৈন্যদের সঙ্গে নিজের নূতন সেনাদল নিয়ে নওরং খাঁ ছুটলেন শত্রুদের গতিরোধ করবার জন্যে। মনে মনে তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—হয় জিত্‌ব, নয় মর্‌ব।

আবার দুই দল হল মুখোমুখী। বাজল কাড়া-নাকাড়া, দুলল যোদ্ধাদের মন, জাগল "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি। আরম্ভ হল সংঘর্ষ।

হ্রেষারবে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে, ধূলিপটলে আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করে তুলে দুই পক্ষের অশ্বরা পরস্পরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সওয়ারদের শাণিত অস্ত্রগুলো দিকে দিকে সৃষ্টি করতে লাগল চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ-চমক, কত সওয়ার, কত ঘোড়া মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে করতে একেবারে স্থির ও নিঃসাড় হয়ে গেল, কত হুঙ্কারের সঙ্গে কত আর্ত্তনাদ মিলিত হয়ে বিদীর্ণপ্রায় করে দিতে লাগল কর্ণপটহ।
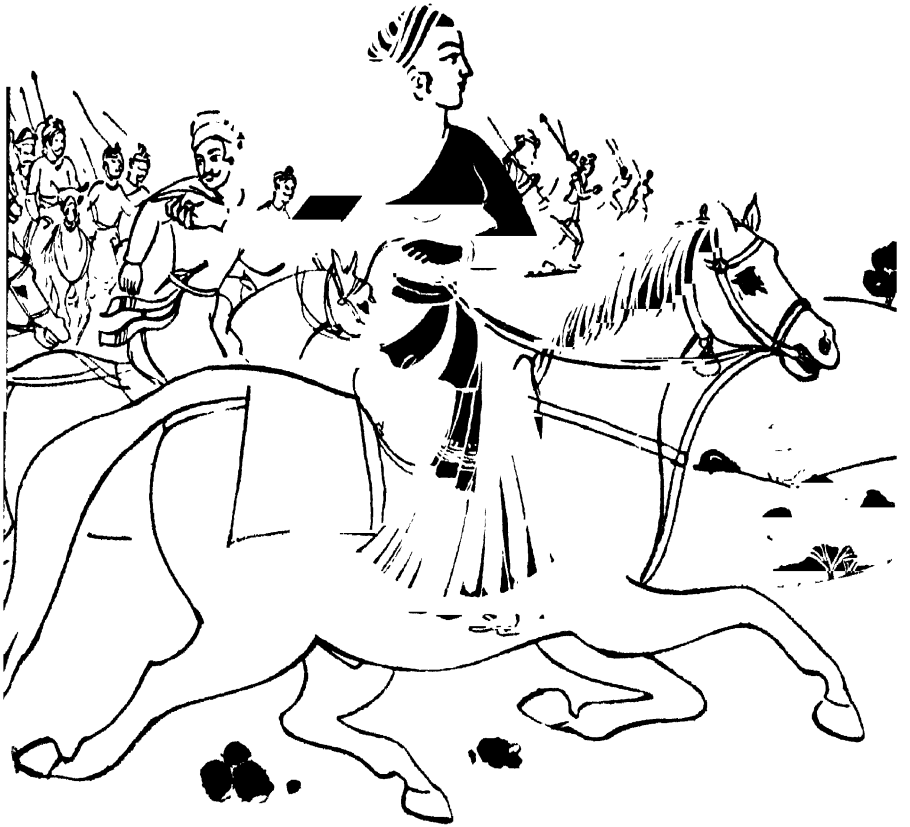
কোথা থেকে সবেগে ছুটে এল এক তরুণ সুকুমার বীর

লড়াই করছেন নওরং খাঁ মত্তহস্তীর মত—যেখানে বিপদ সেখানেই তিনি এবং সেইখানেই ঝক্‌মকিয়ে উঠছে তাঁর অশ্রান্ত হাতের তরবারি। শত্রুসৈন্যরা দলে দলে হতে লাগল পপাত-ধরণীতলে!

কিন্তু বৃথা! নওরং খাঁ নিহত হলেন অবশেষে। নায়কের মৃত্যু দেখে হতাশ হয়ে তাঁর সৈন্যরা রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে উদ্যত হল। সেই সময়ে ঘটল এক অভাবিত ঘটনা। কোথা থেকে সবেগে ছুটে এল এক তরুণ সুকুমার বীর, পরনে তার যোদ্ধার সাজ, চক্ষে তার তীব্র দীপ্তি এবং কণ্ঠে তার দৃপ্ত চীৎকার—"যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর! আমি আহম্মদ খাঁর পুত্র, আমিই তোমাদের চালনা করে যুদ্ধ জয় করব। ফিরে দাঁড়াও, যুদ্ধ কর!"

ফিরে দাঁড়াল আবার পলায়মান সৈন্যগণ। এই নবীন নায়কের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখবার অবসরও তাদের হল না, কিন্তু যেন নূতন জীবন ফিরিয়ে পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে দৃঢ়পদে ও ক্ষিপ্রহস্তে তারা করতে লাগল অস্ত্রচালনা এবং শত্রুসংহার।

নবীন নায়ক এসে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়েও দিল্লীর সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে আর তিষ্ঠতে পারলে না, ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারল পলায়ন করতে লাগল ঊর্দ্ধশ্বাসে। বিজয়-গৌরব অর্জ্জন ক'রে তরুণ নায়কের চারিপাশে দাঁড়িয়ে আহম্মদ খাঁয়ের সৈন্যরা গগনভেদী স্বরে জয়ধ্বনির পর জয়ধ্বনি করতে লাগল।

এই তরুণ নায়ক হচ্ছেন নওরং খাঁয়ের অনামা বান্ধবী!

বন্ধুর মৃত্যু দেখে পুরুষের ছদ্মবেশে তিনি ক্রুদ্ধ সিংহীর মত প্রতিশোধ নিতে ছুটে এসেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

আহম্মদ খাঁ এই সংবাদ পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এবং বীরাঙ্গনার কাছে উপহার পাঠিয়ে দিলেন দশ হাজার টাকার

অলঙ্কার। পনের শতাব্দীতে দশ হাজার টাকার মূল্য ছিল এখনকার চেয়ে অনেক বেশী।

ভারতের মুসলমানদের মধ্যে সৈন্যচালনা করেছেন এমন আরো দুই বীরনারীর নাম অতি বিখ্যাত। রাজিয়া এবং চাঁদবিবি। কিন্তু তাঁরা ছিলেন সুলতানা এবং রাজধর্ম্ম পালনের জন্যে লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করতে অভ্যস্ত। আর নওরং খাঁয়ের বান্ধবী সাধারণ নারী হয়েও অসাধারণ বুদ্ধি, বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়ে বিস্মিত করেছিলেন সবাইকে। এইরকম দ্বিতীয় ঘটনা ইতিহাস তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।

সুলতান বহ্‌লল আবার আহম্মদ খাঁয়ের বিরুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু সে হচ্ছে ভিন্ন গল্প।

ইতিহাসের রক্তাক্ত দৃশ্য

তৈমুরের রক্ত

বিশ্বজিৎ তৈমুর লং!

হ্যাঁ, 'বিশ্বজিৎ' উপাধি তাঁরই প্রাপ্য। উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে রুশিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশে দেশে সগর্ব্বে উড়েছিল তাঁর রক্তাক্ত জয়-পতাকা এবং সমগ্র য়ুরোপের রাজারাজড়ারা সর্ব্বদাই সভয়ে তাঁকে খোসামোদ করে তুষ্ট রাখতে চাইতেন।

ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ছিলেন ঐ তৈমুরেরই ষষ্ঠ বংশধর। তারপর একে একে সিংহাসনে বসেন হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাজাহান। সাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন দারা স্থকো। আজ আমরা এই দারারই করুণ জীবনকাহিনী বর্ণনা করব।

দারার কথা বলতে তৈমুরের কথা মনে পড়ল বিশেষ এক কারণে। তৈমুরের রক্তে কি বিশেষত্ব ছিল জানি না, কিন্তু তাঁর বংশধররা গৃহবিপ্লব, পিতৃদ্রোহ ও ভ্রাতৃবিরোধ প্রভৃতির দ্বারা নিজেদের কলঙ্কিত করেছিলেন যেন বংশানুক্রমেই।

তৈমুরের মৃত্যুর পরেই তাঁর পুত্রগণ সিংহাসনের জন্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে করেছিলেন অস্ত্রধারণ। ফলে তৈমুরের সৃষ্ট অমন বিশাল সাম্রাজ্য কেবল খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে নি, তার অধিকাংশই তাঁর বংশধরদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

বাবর প্রথমে ছিলেন ক্ষুদ্র এক নরপতি। কেবল ব্যক্তিগত শক্তি ও প্রতিভার প্রসাদেই তিনি অধিকার করতে পেরেছিলেন দিল্লীর

সিংহাসন। তাঁর পুত্র ও পৌত্র হচ্ছেন হুমায়ুন ও আকবর। সিংহাসনের কোন ভাগীদার ছিল না বলেই তাঁদের আর ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি করতে বা গৃহযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয় নি।

কিন্তু তারপরেই দেখা গেল, আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর হয়েছেন পিতৃদ্রোহী এবং জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহানও করেছেন পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ। তারপর ঔরংজীবও বংশের ধারা বজায় রাখতে ছাড়লেন না, সম্রাটের আসন অধিকার করলেন তিনি পিতৃদ্রোহ এবং ভ্রাতৃ-হত্যার দ্বারা।

এবং নিয়তির ঐ অভিশাপ থেকে ঔরংজীব নিজেও অব্যাহতি লাভ করেন নি। ঔরংজীবের জীবনকালেই তাঁর পুত্র আকবর বিদ্রোহী হয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরেই অন্যান্য পুত্ররা সিংহাসন লাভের জন্যে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে পিতারই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তারপরেও মোগল রাজবংশ ঐ অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে নি। ভ্রাতৃহত্যার দ্বারা তা কলঙ্কিত হয়েছিল আরো কয়েকবার।

এমন সব অস্বাভাবিক দৃষ্টান্ত এবং একই মারাত্মক দৃশ্যের পৌনঃ-পুনিক অভিনয় পৃথিবীর আর-কোন রাজবংশের ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যাবে না।

দুই

বিষবৃক্ষের বীজ

সম্রাট সাজাহানের চার পুত্র ও দুই কন্যা—তাঁদের নাম যথাক্রমে দারা সুকো, মহম্মদ সুজা, মুহিউদ্দীন মহম্মদ ঔরংজীব ও মহম্মদ মুরাদ

বক্স এবং জাহানারা ও রোশেনারা। সাজাহান যাঁর নাম স্থাপত্যে অমর করে রেখে গিয়েছেন, সেই মমতাজমহলই হচ্ছেন এই ছয় সন্তানের জননী।

দারা সুকো দিলেন জ্যেষ্ঠ। পৃথিবীর সব দেশেই একটা সাধারণ নিয়ম প্রচলিত আছে। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রই হন সিংহাসনের অধিকারী। সুতরাং সম্রাট সাজাহান যে দারাকেই নিজের উত্তরাধিকারী রূপে নির্ব্বাচন করবেন, এটা কিছুমাত্র অন্যায় বা অভাবিত কথা নয়।

কিন্তু তার উপরে একটা বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সম্রাট সাজাহানের হাবে-ভাবে-ব্যবহারে সর্ব্বদাই জাহির হয়ে পড়ত যে, তিনি ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকেই। এই পক্ষপাতিতা অন্যান্য রাজপুত্রদের ভালো লাগত না।

তবে এ ব্যাপারটাও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। পৃথিবীর প্রত্যেক সাধারণ গৃহস্থ-পরিবারের মধ্যেও দেখা যায়, একাধিক পুত্রের পিতারা নিজের কোন একটি ছেলেকে অন্য সন্তানদের চেয়ে বেশী ভালো না বেসে পারেন না।

এমন কি পিতার পক্ষপাতিতার জন্য যে-ঔরংজীব তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সবচেয়ে বিষদৃষ্টিতে দেখতেন, তিনিও তাঁর অতি অক্ষম কনিষ্ঠ পুত্র কামবক্সকে তাঁর অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে বেশী আদর করতেন।

সাধারণ গৃহস্থ পিতার সম্বল বা সম্পদ হয় নগণ্য কিংবা যৎসামান্য। সে ক্ষেত্রে পিতার একদেশদর্শিতার ফলে পুত্রদের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা গেলেও তা আর বেশী দূর পর্য্যন্ত গড়াতে পারে না। কিন্তু যেখানে ভারতবর্ষের মত বিপুল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে কথা, সেখানে ভাইয়ে ভাইয়ে মিল না থাকলে গুরুতর অনর্থপাতের সম্ভাবনাই বেশী। দেখা গেছে, মুকুটের লোভ পারিবারিক স্নেহের বন্ধন মানে না—

পিতা ও পুত্রও হতে পারে পরস্পরের শত্রু। এক্ষেত্রে তাই হয়েছিল।

দারা ছিলেন সাজাহানের নয়নের মণি। দারাকে তিনি নিজের কাছে কাছে রাখতে চাইতেন অহরহ। এবং দারার প্রতি তাঁর এই অতিরিক্ত স্নেহটা বিশেষভাবে জাহির হয়ে পড়ায় অন্যান্য পুত্রের মন হয়ে উঠেছিল হিংসায় পরিপূর্ণ। একটা দৃষ্টান্ত দি।

সাজাহান তাঁর প্রত্যেক পুত্রকে বালক বয়স থেকেই উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে রেখে নানা বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর ছেলেদের রাজকার্য্যে হাতেনাতে অভিজ্ঞ করবার জন্যে প্রেরণ করতেন সাম্রাজ্যের এক এক প্রদেশে রাজপ্রতিনিধিরূপে।

দাক্ষিণাত্য ছিল অশান্তিপূর্ণ এবং রাজধানী দিল্লী থেকে বহুদূরে। সাজাহানের নির্দ্দেশে ঔরংজীবকে রাজপ্রতিনিধিরূপে যেতে হয়েছিল সেইখানে।

মুরাদকেও পাঠানো হয়েছিল দক্ষিণের আর এক প্রদেশে।

মোগল সম্রাটরা নরকের মত ঘৃণা করতেন সুদূর বাংলাদেশকে, কারণ সেখানকার আবহাওয়া পশ্চিমাদের ধাতে সইত না। দ্বিতীয় রাজপুত্র সুজা প্রেরিত হয়েছিলেন ঐ বঙ্গদেশেই।

পাঞ্জাব, এলাহাবাদ ও মূলতান প্রভৃতি প্রদেশ ছিল না অশান্তি-কর ও আপত্তিকর, বরং অর্থকর বলেই তাদের খ্যাতি ছিল। সেই সব প্রদেশেই দারাকে রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত করা হত। উপরন্তু, দারাকে অত দূর পর্য্যন্তও যেতে হত না, তিনি নিজে থাকতেন পিতার আশেপাশেই, প্রাদেশিক শাসনকার্য্য পরিচালনা করতেন তাঁর দ্বারা নিযুক্ত কোন প্রতিভূ।

সাজাহান যখন সসম্মানে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন থেকেই দারা

হয়ে উঠেছিলেন সাম্রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি,—তাঁর আসন ছিল সম্রাটের পরেই। তাঁকে "শাহী-বুলন্দ্-ইক্‌বাল্" (বা মহৎ সৌভাগ্যের রাজা) নামে সুদুর্লভ ও মহাসম্মানকর উপাধিতে ভূষিত এবং চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈনিকের নায়কের পদ প্রদান করা হয়েছিল। যে প্রভূত অর্থ তাঁর জন্যে বৃত্তি বলে বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা বহু নৃপতিরও হিংসা উদ্রেক করতে পারত। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতানুসারে, দারার বাৎসরিক বৃত্তির পরিমাণ ছিল দেড় কোটি থেকে দুই কোটি টাকা! আজকের হিসাবে ঐ টাকার পরিমাণ হবে কত গুণ বেশী, সকলে তা ক'ষে দেখতে পারেন।

রাজসভায় সম্রাটের কাছেই থাকত যুবরাজ দারার জন্যে নির্দ্দিষ্ট সোনার সিংহাসন—ময়ূর সিংহাসনের চেয়ে তার উচ্চতা খুব কম ছিল না। সামরিক পদমর্য্যাদায় দারার পুত্ররাও ছিলেন সম্রাটের অন্যান্য পুত্রদের সমকক্ষ।

মুখাপেক্ষী কিংবা সামন্ত রাজারা, উপাধি বা পদপ্রার্থীরা এবং সম্রাটের বিরক্তিভাজন কৃপাপ্রার্থীরা সাজাহানের কাছে যাবার আগে দারার কাছে গিয়ে ধর্ণা দিতেন। পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী এবং নূতন উপাধিধারিগণ যুবরাজের কাছে নতি স্বীকার করবার জন্য স্বয়ং সম্রাট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হতেন।

শেষের দিকে সম্রাটের সামনে বসে বা তাঁর অনুপস্থিতিকালেও শাসনকার্য্য পরিচালনা করতেন দারাই স্বয়ং। এমন কি তিনি স্বাধীনভাবে সম্রাটের নাম ও শীলমোহর পর্য্যন্ত ব্যবহার করতে পারতেন।

ব্যাপার দেখে অন্যান্য রাজপুত্রের মনে হিংসা ও ক্রোধের সীমা ছিল না। এইভাবে দিল্লীর রাজপরিবারের মধ্যে গোড়া থেকেই বোনা হয়েছিল বিষবৃক্ষের বীজ।

তিন

মানুষ দারা

শত্রুরা দারার চরিত্রকে কালো রঙে এঁকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য দেখে বোঝা যায়, সেটা হয়েছে অপচেষ্টা মাত্র।

দারা ছিলেন ভদ্র ও বিনয়ী এবং বন্ধু ও দুর্গতদের সাহায্য করবার জন্যে প্রস্তুত। পত্নী ও পুত্রদের তিনি খুব ভালোবাসতেন এবং পিতাকেও করতেন রীতিমত শ্রদ্ধা।

কিন্তু তিনি আজন্ম লালিতপালিত হয়েছিলেন অসামান্য সৌভাগ্যের কোলে, যখন যা চেয়েছেন তা পেয়েছেন অনায়াসেই এবং কখনো কিছুমাত্র দুঃখবোধ করেন নি। তাই ছিল না তাঁর দূরদৃষ্টি ও মানুষ চেনার ক্ষমতা। মনের ও বুদ্ধির জোরে প্রতিবন্ধকতাকে এড়িয়ে যাবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না।

সাজাহানের কন্যা জাহানারার আত্মজীবনীতে প্রকাশ, প্রপিতামহ আকবর যে স্বপ্ন দেখতেন, প্রপৌত্র দারা নিজের জীবনে তাকেই সম্ভবপর করে তোলবার চেষ্টা করতেন। আকবর হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের অবসান এবং এক নূতন ও উদার ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করতে চেয়েছিলেন। দারারও কাম্য ছিল তাই।

কিন্তু কেবল স্বপ্ন দেখেই রাজদণ্ড পরিচালনা করা যায় না। সর্ব্বত্র উদারতার সাধনা করা রাজধর্ম্মের বিরোধী। আকবর ছিলেন কূটকচালে রাজনীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞ—দারা যা ছিলেন না। আকবরের ছিল প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধপ্রতিভা। দারাও যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু সেনাপতির কর্ত্তব্যপালন করতে পারতেন না।

একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক দারার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যা বলেছেন, তার সারমর্ম্ম হচ্ছে এই :

দারা ছিলেন সর্ব্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, তাই তিনি ইহুদীদের ধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, মুসলমানদের সুফীধর্ম্ম (যার সঙ্গে আমাদের বৈষ্ণবধর্ম্মের মিল দেখা যায়) এবং হিন্দুদের বেদান্তধর্ম্ম অনুশীলন করেছিলেন।

তাঁর দ্বারা একদল হিন্দু পণ্ডিতের সাহায্যে পার্শী ভাষায় উপনিষদ অনূদিত হয়েছিল। তাঁর আর একখানি পুস্তকের নাম হচ্ছে, "মাজমুয়া-উল-বাহারিণ" বা "দুই সাগরের সম্মিলন"। তা পাঠ করলে বোঝা যায়, তাঁর লক্ষ্য ছিল এমন এক মিলনক্ষেত্র আবিষ্কার করা, যেখানে এসে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারে।

তিনি হিন্দু যোগী লালদাস ও মুসলমান ফকির সারমাদের পদতলে বসে শিষ্যের মত মনোযোগ দিয়ে উভয়ের উপদেশবাণী শ্রবণ করতেন।

তাব'লে তিনি স্বধর্ম্মবিরোধী ছিলেন না। তিনি মুসলমান সাধুদের একখানি জীবনচরিত সঙ্কলন করেছিলেন। শিষ্যরূপে তাঁর দীক্ষা হয়েছিল মুসলমান সাধু মিয়ান মীরের কাছে—কোন কাফেরের পক্ষে যা ছিল অসম্ভব। দারার নিজের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি ইসলামের মূল ধর্ম্মমতে অবিশ্বাসী ছিলেন না।

কিন্তু তিনি ছিলেন হিন্দুদের বন্ধু। অন্যান্য গোঁড়া মুসলমানের মত তিনি কোন দিনই হিন্দুদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' বা ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করতে পারতেন না। এইসব কারণে, বিশেষ করে হিন্দুদের কাছে দারা ছিলেন অত্যন্ত লোকপ্রিয়।

চার

ঔরংজীব বা শ্বেতসর্প

আলোচ্য নাটকীয় কাহিনীর প্রধান ও প্রথম নায়ক দারা এবং দ্বিতীয় নায়ক হচ্ছেন ঔরংজীব। এইবারে তাঁরও একটু পরিচয়ের দরকার।

ঔরংজীব ছিলেন দারার চেয়ে কিছু কম, চার বৎসরের ছোট। সম্রাট সাজাহানের অন্যান্য পুত্রের মত বাল্যে ও যৌবনে উপযুক্ত শিক্ষকদের অধীনে তিনিও বিদ্যালাভের যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন।

আরবী, পার্সী, হিন্দী ও তুর্কী ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। কাব্যের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা না থাকলেও তিনি কয়েকজন কবির উপদেশ-পূর্ণ রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং দরকার হলেই মুখে মুখে তাঁদের বচন উদ্ধার করতে পারতেন। তিনি ইতিহাস পছন্দ করতেন না, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করতে ভালবাসতেন। নাচ-গান-ছবি তিনি পছন্দ করতেন না।

জাহানারার আত্মকাহিনীতে বালক ঔরংজীব সম্বন্ধে একটি কাহিনী পাঠ করা যায়। তাঁর পিতামহ জাহাঙ্গীর ও পিতা সাজাহান দুজনেই প্রথম বয়সে হয়েছিলেন পিতৃদ্রোহী। সাজাহানেরও তাই ভয় ছিল যে, তাঁর পুত্ররাও হয়তো কোনদিন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। সেইজন্যে এক ভবিষ্যদ্বক্তা সন্ন্যাসীকে তিনি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আমার কোন ছেলে কি আমার বিরুদ্ধাচারণ করে সাম্রাজ্য নষ্ট করবে?”

সন্ন্যাসী বলেছিলেন, “হ্যাঁ।”

—“কে সে?”

—“যে সবচেয়ে ফর্সা।”

ঔরংজীবের গায়ের রং ছিল অতিশয় শুভ্র। ভবিষ্যদ্বাণীর সময় তাঁর বয়স ছিল দশ বৎসর মাত্র। সাজাহান কিন্তু সেই দিন থেকেই তাঁকে আর ভাল চোখে দেখতেন না এবং তার নাম রেখেছিলেন "শ্বেতসর্প"।

বালক বয়েস থেকেই ঔরংজীব ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও বীর। এখানে তাঁর সাহস ও বীরত্বের একটি গল্প দেওয়া গেল ঃ

কিন্তু তার আগে আর একটি কথা বলা উচিত। মোগল সম্রাট ও রাজপুত্ররা—অর্থাৎ তৈমুরের বংশধররা চিরদিনই ছিলেন বীরত্ব ও সাহসের জন্যে বিখ্যাত, তৈমুরের রক্তে কাপুরুষের জন্ম হয়নি বললেও চলে। মোগল রাজবংশের উৎপত্তি যে তৈমুরের রক্ত থেকেই, এর জন্যে তাঁরা ছিলেন মনে মনে গর্ব্বিত।

ঔরংজীবের ছোট ছেলে কামবক্স ছিলেন নির্ব্বোধ, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ও প্রমোদপ্রিয়—তাঁকে অকালকুষ্মাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করলেও অন্যায় হবে না।

মেজো ভাই সম্রাট বাহাদুর শাহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে অনায়াসেই তিনি পলায়ন করতে পারতেন। কিন্তু পালাবার নাম মুখেও না এনে লড়তে লড়তে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন এবং মরবার আগে বলে যান—আমি হচ্ছি তৈমুরের বংশধর, পাছে কেউ আমাকে কাপুরুষ ভাবে সেই ভয়েই স্বেচ্ছায় আমি মৃত্যুকে বরণ করেছি।

এইবারে গল্পটা বলি।

যে সময়ের কথা বলছি তখন ঔরংজীবের বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর।

সম্রাট সাজাহানকে হাতীর লড়াই দেখানো হচ্ছে, আশেপাশে দর্শকরূপে রাজপুত্র ও আমীর-ওমরাওদের সঙ্গে উপস্থিত আছে সৈন্য-সামন্ত ও এক বৃহতী জনতা।

আচম্বিতে একটা হাতী ক্ষেপে গিয়ে তেড়ে এল অশ্বারোহী ঔরংজীবের দিকে। তখনও পালাবার পথ খোলা ছিল, কিন্তু ঔরংজীব সে কথা মনেও আনলেন না। পাছে ঘোড়া ভয় পেয়ে সরে পড়ে, তাই তিনি তার বল্গা টেনে রেখে স্থিরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। হাতীটা আরো কাছে এগিয়ে এল, ঔরংজীব বল্লম তুলে সজোরে তার দিকে নিক্ষেপ করলেন।

হৈ হৈ রব উঠল চারিদিকে। আমীর-ওমরাও এবং অন্যান্য লোকজন ছুটোছুটি ও চেঁচামেচি করতে লাগল—হাতীকে ভয় পাওয়াবার জন্যে অনেক আতসবাজী ছোঁড়া হ'ল—কিন্তু বৃথা!

মত্তমাতঙ্গ ছুটে এসে শুঁড়ের এক আঘাতে ঘোড়াটাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে—আর রক্ষা নেই!

ঔরংজীব এক লাফে মাটির উপরে লাফিয়ে পড়ে, খাপ থেকে তরোয়াল খুলে অটল পদে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন হাতীর সামনে।

হঠাৎ দৈবগতিকে হ'ল দৃশ্য পরিবর্ত্তন! একে তো ভীষণ হট্টগোলে, বল্লমের খোঁচায় ও আতসবাজির সশব্দ অগ্নিকাণ্ডে হাতীটা চমকে ও ভেবড়ে গিয়েছিল, তার উপরে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হাতীটাও আবার রুখে উঠে তাকে আক্রমণ করতে আসছে দেখে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে কালবিলম্ব করলে না।

ফাঁড়া উৎরে গেল ভালোয় ভালোয়, সকলে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

সাজাহান তাঁর বীর সন্তানকে সাদরে বুকের ভিতরে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি বুঝলেন, একদিক দিয়ে ঔরংজীব হচ্ছেন তাঁরই যোগ্য পুত্র, কারণ তিনিও যৌবনে পিতা জাহাঙ্গীরের চোখের সামনে তরবারি হাতে নিয়ে নির্ভয়ে আক্রমণ করেছিলেন এক বন্য ও দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্রকে।

আচম্বিতে একটা হাতী ক্ষেপে গিয়ে তেড়ে এল

ঔরংজীব লাভ করলেন 'বাহাদুর' উপাধি এবং পুরস্কার স্বরূপ দুই লক্ষ টাকা দামের উপহার ও নগদ পাঁচ হাজার মোহর।

ছেলের গোঁয়ারতুমির জন্য সম্রাট যখন মৌখিক ভর্ৎসনা করলেন, ঔরংজীব উত্তরে বললেন, "পলায়নই ছিল লজ্জাকর। আমি মরলেও সেটা লজ্জার বিষয় হ'ত না। মৃত্যু সম্রাটকেও ছেড়ে দেয় না, তাতে সম্মানহানি হয় না।"

দারা বাপের আদুরে ছেলে ব'লে রাজপুত্ররা সবাই অসন্তুষ্ট ছিলেন, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু দারার প্রতি ঔরংজীবের অসন্তোষ, ক্রোধ ও আক্রোশ ছিল আর সকলেরই চেয়ে বেশী। এ বিদ্বেষ তাঁর বাল্যকাল থেকেই এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিদ্বেষও বেড়ে উঠেছিল ক্রমে ক্রমে।

ঔরংজীব তখন দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি এবং তাঁর বয়স ছাব্বিশ বৎসর। জ্যেষ্ঠ দারা পিতার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র ব'লে মন তাঁর তিক্তবিরক্ত। তাঁর তখনকার মৌখিক ভাষায় এবং চিঠিপত্রে দারার প্রতি এই বিষম আক্রোশটা সর্ব্বদাই প্রকাশ পেত। তার উপরে সেই সময়ে এমন এক ঘটনা ঘটল যার ফলে সেই বিরাগটা হয়ে উঠল দস্তুরমত বিজাতীয়।

দৈবগতিকে আগুনে পুড়ে সহোদরা জাহানারার জীবন নিয়ে টানা-টানি চলছে। বোনকে দেখবার জন্যে ঔরংজীব এলেন আগ্রা সহরে।

সেই সময়ে সেখানে যমুনাতীরে দারা নিজের জন্যে তৈরি করিয়ে-ছিলেন এক নতুন প্রাসাদ। একদিন তিনি পিতা ও তিন ভ্রাতাকে প্রাসাদ দেখবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন।

গ্রীষ্মের দারুণ উত্তাপ থেকে নিস্তার পাবার জন্যে সেখানে ভূগর্ভে নির্ম্মাণ করা হয়েছিল একটি কক্ষ এবং তার মধ্যে আনাগোনা করবার জন্যে ছিল একটিমাত্র দ্বার।

দারার সঙ্গে সঙ্গে সাজাহান, সুজা ও মুরাদ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন, কিন্তু ঔরংজীব একা ব'সে রইলেন দ্বারের কাছে।

সাজাহান বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তাঁর ঐ আশ্চর্য্য ও অশোভন ব্যবহারের কারণ কি, তিনি কিন্তু চুপ ক'রে ব'সে রইলেন সেইখানেই, কোন জবাব দিলেন না।

তাঁর এই অবাধ্যতার শাস্তি হ'ল গুরুতর। কেবল তাঁর বৃত্তিই বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল না, দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধিত্ব ও রাজসভায় প্রবেশাধিকার থেকেও তিনি বঞ্চিত হ'লেন।

সুদীর্ঘ সাতমাসকাল অলস ভাবে ব'সে থাকবার ও অপমানকর জীবনযাপন করবার পর অবশেষে জাহানারার কাছে তিনি তাঁর অবাধ্যতার কারণের কথা খুলে বললেন:

—"ঘরের একটি মাত্র দরজা, বাইরে যাবার দ্বিতীয় পথ নেই। আমি ভেবেছিলুম সেখানে সুযোগ পেয়ে দারা আমাদের সকলকে হত্যা ক'রে সিংহাসনের পথ সুগম করে ফেলবেন! তাই পাহারা দেবার জন্যে আমি দরজার কাছেই ব'সেছিলুম।"

দেখা যাচ্ছে, যৌবন বয়সেই ঔরংজীবের মনে ধারণা জন্মেছিল, দারাই হচ্ছেন তাঁর প্রধান শত্রু এবং সিংহাসনের লোভে ভ্রাতৃহত্যা—এমন কি পিতৃহত্যা করাও অত্যন্ত স্বাভাবিক!

এই একটি ঘটনার মধ্যেই ঔরংজীব চরিত্রের সমস্ত রহস্যের হদিস পাওয়া যাবে। বীজ থেকে বিষবৃক্ষের জন্ম হয়েছে তখনই, বাকি কেবল ফল ধরা!

সাতমাস পরে ভগ্নী জাহানারা ভ্রাতা ঔরংজীবের জন্য পিতার কাছে ধর্ণা দিলেন। মেয়েদের মধ্যে জাহানারাই ছিলেন সবচেয়ে প্রিয়পাত্রী। তাঁর অনুরোধ সাজাহান ঠেলতে পারলেন না, ঔরংজীবের অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে রাজপ্রতিনিধিরূপে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন গুজরাট প্রদেশে।

পাঁচ

রোগশয্যায় সাজাহান

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ। পরিপূর্ণ সুখ, সমৃদ্ধি ও গৌরবের মাঝখানে ভারত সম্রাট সাজাহান অকস্মাৎ সাংঘাতিক ব্যাধির আক্রমণে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন।

সম্রাট বাইরে আর দেখা দেন না, দরবারও আর বসে না। রোগীর গৃহে রাজ-সভাসদদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। রোগশয্যার পাশে যেতে পারতেন একমাত্র দারাই।

হপ্তাখানেক ধ'রে চিকিৎসকদের প্রাণপণ চেষ্টার পর সম্রাটের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হ'ল বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তিনি শয্যা ছাড়তে পারলেন না। চিকিৎসকরা উপদেশ দিলেন বায়ুপরিবর্ত্তন করতে। দিল্লী থেকে তাঁকে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। তবু তাঁর অসুখ সারল না।

ইতিমধ্যে নিজের আসন্নকাল উপস্থিত হয়েছে ভেবে, সম্রাট আমীর-ওমরাওদের আহ্বান করে সকলের সামনে ঘোষণা করেছেন, তাঁর অবর্ত্তমানে সিংহাসনের মালিক হবেন যুবরাজ দারাই।

আগ্রায় এসে সম্রাট আশ্রয় গ্রহণ করেছেন দারার নিজস্ব প্রাসাদেই। দারা সেখানে আর কাউকে ঢুকতে দেন না, একাই সেবাশুশ্রূষা ক'রে পিতাকে নিরাময় ক'রে তোলবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকেন এবং সম্রাটের নামে নিজেই রাজকার্য্য পরিচালনা করেন।

ওদিকে বাইরে গুজবের অন্ত নেই। দিকে দিকে জনরব উঠল, সম্রাটের মৃত্যু হয়েছে, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দারা সে খবর গোপন রাখতে চান।

সুজা, মুরাদ ও ঔরংজীব এই সুযোগই খুঁজছিলেন, স্বরূপ প্রকাশ করতে তাঁরা আর বিলম্ব করলেন না।

বাংলা দেশের রাজপ্রতিনিধি সুজা সেইখানে ব'সেই নিজেকে ভারতসম্রাট ব'লে ঘোষণা করলেন।

গুজরাটের তখনকার রাজপ্রতিনিধি মুরাদও পিছনে প'ড়ে থাকবার পাত্র নন—তিনিও ধারণ করলেন ভারতসম্রাটের পদবী!

দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন ঔরংজীব। ভ্রাতাদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন সবচেয়ে ধূর্ত্ত ও সাবধানী। তিনি সহজে মুখোস খুললেন না। তিনিও সৈন্যাদি সংগ্রহ ক'রে যুদ্ধের তোড়জোড় করতে লাগলেন বটে, কিন্তু গাছে কাঁঠাল দেখেই গোঁফে তেল মাখতে চাইলেন না—অর্থাৎ প্রথমেই ধারণ করলেন না সম্রাট উপাধি।

মুরাদ ছিলেন তাঁর কাছেই এবং তিনি জানতেন ভাইদের মধ্যে মুরাদই হচ্ছে সবচেয়ে নির্ব্বোধ। তার উপরে তিনি উগ্র এবং গোঁয়ার-গোবিন্দ। কিন্তু তিনি ছিলেন রীতিমত যোদ্ধা; একবার রণক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়ালেই তাঁর ধমনীর মধ্যে তৈমুরের রক্ত টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটে উঠত। এমন লোককে সহজেই টানা যায় এবং এমন লোককে দলে টানতে পারলে যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা।

অতএব ঔরংজীব মিষ্ট কথায় মুরাদকে বোঝালেন যে, দারা হচ্ছে অধার্ম্মিক, নমাজ পড়ে না, রমজানের উপবাস করে না, তার বন্ধু হচ্ছে হিন্দু যোগী, সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণগণ। সর্ত্ত হ'ল যে, আগে দুইজনে মিলে এমন নাস্তিক লোককে পথ থেকে সরাতে হবে, তারপরে যুদ্ধে জয়লাভ করলে মুরাদ হবেন পাঞ্জাব, আফগানিস্থান, কাশ্মীর ও সিন্ধু প্রদেশের মুকুটধারী স্বাধীন নরপতি এবং সাম্রাজ্যের বাকি অংশ লাভ করবেন ঔরংজীব। সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে,

সর্ত্তের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন ব'লে ঔরংজীব পবিত্র কোরাণ পর্য্যন্ত স্পর্শ করতে ভোলেন নি। সরল বিশ্বাসী মুরাদও এই সর্ত্তে রাজী হয়ে গেলেন।

সবাই মিলে একজোট হয়ে দাঁড়াবে আক্রমণ করবার জন্যে। সুজাকেও ফুসলে দলে ভেড়াবার ইচ্ছা ছিল ঔরংজীব ও মুরাদের, কিন্তু বাংলা অত্যন্ত দূরদেশ ব'লে ইচ্ছাটা শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নি।

ইতিমধ্যে সাজাহান রোগমুক্ত হয়ে সমস্ত খবর শুনলেন। তাড়াতাড়ি স্বহস্তে পত্র লিখে সিংহাসনপ্রার্থী তিন পুত্রকে জানালেন যে, তিনি ইহলোকেই বর্ত্তমান এবং সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত। কিন্তু তাতেও ফল হ'ল না। পুত্ররা সন্দেহ করলেন, জাল পত্র পাঠিয়ে দারা তাঁদের ঠকাবার চেষ্টা করছে।

সম্রাটের সম্মতি নিয়ে দারা তখন সুজা, ঔরংজীব ও মুরাদের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক বৃহৎ ফৌজ প্রেরণ করলেন। সেই তিন ফৌজের সঙ্গে গেলেন সাজাহানের প্রধান প্রধান খ্যাতিমান সেনাপতিরা, ফলে দারার কাছে আগ্রায় যে সেনাদল রইল, তাদের চালনা করবার মত যোগ্য সেনাপতির অভাব হ'ল অত্যন্ত।

এই গৃহযুদ্ধের সময়ে রোগদুর্ব্বল, জরাজর্জ্জর সাহাজানের অবস্থা হয়েছিল অতিশয় করুণ। যারা এখন পরস্পরের সঙ্গে হানাহানি করতে উদ্যত, তারা প্রত্যেকেই তাঁর নিজের রক্তে গড়া পুত্র, কত আদরের ও স্নেহের নিধি, তাদের যে-কোন একজনকে আঘাত করলে সে আঘাত বাজবে তাঁর নিজেরই বুকে!

যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে ভারতসম্রাট সাজাহান সাধারণ পিতার মতই কাতরভাবে তাঁর সেনাপতিদের কাছে মিনতি জানালেন, যেন তাঁর পুত্রদের কোন অনিষ্ট না হয়, যেন বিনা যুদ্ধেই মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের আবার যথাস্থানে ফিরে যেতে বলা হয়!

যুদ্ধ যখন বাধে, তখন সাজাহানের বয়স আটষট্টি। তাঁর প্রত্যেক পুত্রও তখন যৌবনের সীমা অতিক্রম করেছেন—দারার বয়স হয়েছিল তেতাল্লিশ, সুজার বয়স একচল্লিশ, ঔরংজীবের উনচল্লিশ এবং মুরাদের তেত্রিশ।

ষষ্ঠ

ধরমাট ও সামুগড়

ঔরংজীব ও মুরাদের বিরুদ্ধে যে সেনাদল প্রেরিত হয়েছিল তার সেনাপতি ছিলেন মহারাজা যশোবন্ত সিংহ এবং কাসিম খাঁ ছিলেন তাঁর সহযোগী সেনাপতি। উজ্জয়িনী নগরের নিকটস্থ ধরমাট নামক স্থানে দুইপক্ষের প্রথম শক্তিপরীক্ষা হয়। উভয় পক্ষেই সৈন্যসংখ্যা ছিল কিছু বেশী—পঁয়ত্রিশ হাজার।

রাজপুত ও মুসলমান নিয়ে দারার সৈন্যদল গঠিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ছিল না কিছুমাত্র একতা। রাজপুতরা বীরের মত লড়তে ও মরতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই ছিল বিশ্বাসঘাতক এবং মনে মনে ঔরংজীবের পক্ষপাতী। তাই যুদ্ধ শেষ হ'লে দেখা গিয়েছিল, চব্বিশজন রাজপুত সর্দ্দার নিহত হয়েছেন এবং মুসলমানদের মধ্যে মারা পড়েছেন একজন মাত্র সেনাপতি। মুসলমানরা কেবল যে ভালো ক'রে লড়েনি, তা নয়; লড়াই শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চার-চারজন মুসলমান সেনাপতি শত্রুপক্ষে যোগদান করেছিল।

উপরন্তু ঔরংজীবের ফৌজে ছিল সুনিপুণ ফরাসী ও ইংরেজ গোলন্দাজগণ; দারার বা সম্রাটের ফৌজে ছিল না আগ্নেয়াস্ত্র। কাজেই ধরতে গেলে কামানের সঙ্গে লড়তে হয়েছিল তরবারিকে।

এমন যুদ্ধের ফল যা হওয়া উচিত, তাই হ'ল। হাজার হাজার রাজপুত সৈন্য প্রাণদান করলে বটে, কিন্তু জয়লাভ করতে পারলে না। যশোবন্ত সিংহকে রণক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করতে হ'ল।

জাহানারা বলেন, আগ্রায় যখন খবর এল, ধরমাটের যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ঔরংজীব সদলবলে রাজধানীর দিকে ছুটে আসছেন, তখন বিপুল সম্পদের মধ্যেও হতভাগ্য সম্রাট সাজাহান আকাশের দিকে হাত তুলে আর্ত্তকণ্ঠে ব'লে উঠেছিলেন—"হে ঈশ্বর, তোমারি ইচ্ছা!"

তারপর তিনি নিজেই যুদ্ধযাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে সেনাপতিদের আহ্বান ক'রে আদেশ দিলেন, "অবিলম্বে সৈন্য সমাবেশ কর!"

কিন্তু সম্রাটের পরামর্শদাতাদেরও মধ্যে ঔরংজীবের চরের অভাব ছিল না। তারা বেশ জানত, সাজাহান স্বয়ং সেনাদলের পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়ালে বিলুপ্ত হবে বিদ্রোহী পুত্রদের সমস্ত আশা-ভরসা! অতএব তারা নানা মিথ্যা কারণ বা ভয় দেখিয়ে যুদ্ধযাত্রা থেকে সম্রাটকে নিরস্ত করে।

দারা তাড়াতাড়ি ষাটহাজার নূতন সৈন্য সংগ্রহ ক'রে ঔরংজীব ও মুরাদকে বাধা দেবার জন্যে অগ্রসর হ'লেন। এই নূতন সৈন্যরা দলে ভারী হ'ল বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল শিক্ষিত যোদ্ধার অভাব।

এবারও ফৌজের মধ্যে মুসলমান সেনানী ও সৈনিকদের মধ্যে অনেকেই ছিল শত্রুপক্ষের চর বা ঔরংজীবের পক্ষপাতী। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের উনত্রিশে মে তারিখে সামুগড়ের প্রান্তরে যে যুদ্ধ হ'ল, তাতেও প্রধান অংশ গ্রহণ করলে রাজপুত যোদ্ধারাই—তারাই হিন্দুদের প্রিয় দারার স্বার্থরক্ষার জন্যে দলে দলে লড়তে ও মরতে লাগল এবং ফৌজের প্রায় অর্দ্ধেক মুসলমান সৈন্য ছিল বিশ্বাসঘাতক, তারা মুখরক্ষার জন্যে করলে কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় মাত্র।

ফলে এবারেও হ'ল যুবরাজ দারার শোচনীয় পরাজয়।

সপ্তম

যুদ্ধের পর

সামুগড়ের যুদ্ধে সম্রাটের ফৌজ পরাজিত এবং ঔরংজীব ও মুরাদ সসৈন্যে আগ্রার দিকে ধাবমান, এই দুঃসংবাদ বহন ক'রে নিয়ে এল এক ফিরিঙ্গী ভগ্নদূত।

রাত্রের অন্ধকারে গা ঢেকে পরাজিত, পরিশ্রান্ত ও দুঃখে মুহ্যমান দারা কয়েক জন অনুচরের সঙ্গে আগ্রায় ফিরে এলেন বটে, কিন্তু দুর্গের মধ্যে প্রবেশ না করে নিজের প্রাসাদের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

দুর্গের মধ্যে অপেক্ষা করছিলেন বৃদ্ধ সম্রাট সাজাহান—গভীর নিরাশার প্রস্তরীভূত মূর্ত্তির মত। প্রিয় পুত্র দারাকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন, কিন্তু উত্তরে দারা লিখে জানালেন, "এই শোচনীয় দুর্দ্দশার দিনে সম্রাটের কাছে মুখ দেখাবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার সামনে রয়েছে যে সুদীর্ঘ পথ, আপনার আশীর্ব্বাদ ও আদেশ পেলে আমি এখন সেই পথেরই পথিক হব।"

মর্ম্মাহত সাজাহানের মনে হ'ল, তাঁর আত্মা যেন দেহপিঞ্জর ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু শত্রুরা এখন হিংস্র শার্দ্দূলের মত অসহায় দারার বিরুদ্ধে বেগে ছুটে আসছে, তাঁর আর দুঃখ প্রকাশ করবারও অবসর নেই। তিনি তৎক্ষণাৎ দুর্গপ্রাসাদের ধনভাণ্ডার খুলে পুঞ্জ পুঞ্জ ধনরত্ন স্নেহাস্পদ দারার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

আগ্রা থেকে দারা যাবেন দিল্লীতে। সেখানকার শাসনকর্ত্তার কাছেও সম্রাটের আদেশ গেল—দিল্লীর ধনভাণ্ডারের চাবি যেন দারার হাতে সমর্পণ করা হয়।

জন বারো অনুচর ও রক্ষী নিয়ে পলাতক দারা সহধর্ম্মিণী নাদিরা বানু ও সন্তানদের সঙ্গে বিপদজনক আগ্রা নগরী ত্যাগ করলেন। বিজয়ী সৈন্যদলের সঙ্গে নিষ্ঠুর ঔরংজীব আগ্রা অধিকার করতে আসছে, একবার তার কবলে গিয়ে পড়লে যে তাঁর মুক্তিলাভের কোন উপায়ই থাকবে না, এ কথা দারা ভালো ক'রেই জানতেন।

তারপর আগ্রায় যে অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণা হ'ল তার কথা এখানে বর্ণনা করবার দরকার নেই, কারণ আমাদের এখন যেতে হবে এই কাহিনীর নায়ক দারার পিছনে পিছনে।

তবে দু-চারটে কথা উল্লেখযোগ্য। ঔরংজীব আগ্রা অধিকার ও দুর্গ অবরোধ করলেন। তাঁকে বোঝাবার জন্যে একবার শেষ চেষ্টা করবার উদ্দেশ্যে ঔরংজীবের সঙ্গে সম্রাট দেখা করতে চাইলেন।

কিন্তু ঔরংজীব নারাজ।

তখন সম্রাট-কন্যা জাহানারা নূতন এক প্রস্তাব নিয়ে ভ্রাতা ঔরংজীবের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। প্রস্তাবটি হচ্ছে এই ঃ

সম্রাটের ইচ্ছা যে, সাম্রাজ্য চার রাজপুত্রদের জন্যে চার ভাগে বিভক্ত করা হোক্।

দারাকে দেওয়া হোক পাঞ্জাব ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলি।

মুরাদের জন্যে গুজরাট, সুজার জন্যে বঙ্গদেশ এবং ঔরংজীবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সুলতানের জন্যে দাক্ষিণাত্য।

সাম্রাজ্যের বাকি অংশ এবং সাজাহানের অবর্ত্তমানে সিংহাসনের অধিকারী হবেন দারার বদলে ঔরংজীব।

ঔরংজীব কিন্তু নিজের সংকল্পে অটল। জবাবে জানালেন, "দারা হচ্ছে ইসলামে অবিশ্বাসী ও হিন্দুদের বন্ধু। সত্য ধর্ম্ম ও সাম্রাজ্যের শান্তির জন্যে দারাকে একেবারে উচ্ছেদ না ক'রে আমি ছাড়ব না।"

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাজাহান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন এবং সুদীর্ঘ সাত বৎসরকাল আগ্রা দুর্গে বন্দীজীবন যাপন করবার পর তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স পূর্ণ চুয়াত্তর বৎসর।

মুরাদের সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলবার নেই। নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ঔরংজীব যে তাঁকে স্বহস্তচালিত যন্ত্রের মত ব্যবহার করেছেন, নির্ব্বোধ মুরাদ শেষ পর্যন্ত এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি করতে পারেন নি—যেদিন তাঁর চটকা ভাঙল, সেদিন তিনি বন্দী। সে হচ্ছে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের পঁচিশে জুন তারিখের কথা। তিন বৎসর পরে গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে পলায়নের চেষ্টা ক'রেছিলেন ব'লে ঔরংজীবের ইচ্ছানুসারে কাজীর বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সুজাও করেছিলেন সিংহাসনের লোভে অস্ত্রধারণ। প্রথম যুদ্ধে তিনি দারার পুত্র সুলেমান সুকোর কাছে পরাজিত হন, কিন্তু তার-পর তাঁর সঙ্গে দারার কাহিনীর আর কোন সম্পর্ক নেই। তারপর তিনি ঔরংজীবের কাছে বার বার হার মেনে ভারত ছেড়ে আরাকানে গিয়ে মগদের হাতে মারা পড়েন, কিন্তু সে সব কথা হচ্ছে এখানে অবান্তর।

অষ্টম

পলাতক ও বন্দী দারা

অতঃপর দারার জীবনের কথা বলতে গেলে বলতে হবে কেবল দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনার কাহিনী। এতদিন জীবন ছিল তাঁর সুদীর্ঘ এক সুখস্বপ্নের মত, কিন্তু সামুগড়ের যুদ্ধের পর তিনি এ জীবনে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যেও সুখশান্তির ইঙ্গিত পর্য্যন্ত দেখতে পান নি। সুখ আর দুঃখ, দুয়েরই দান পেয়েছিলেন তিনি অপরিমিত মাত্রায়।

দিল্লীতে এসে দারা আবার নূতন ফৌজ গঠনের জন্য তোড়জোড় করতে লাগলেন। কতক সৈন্য সংগৃহীত হ'ল বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা হ'ল না সন্তোষজনক।

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমান সুকোকে বাইশ হাজার সৈন্য দিয়ে সুজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত দুই সেনাপতি—মির্জ্জা রাজা জয়সিংহ ও দিলির খাঁ। দারা তাঁদের দিল্লীতে এসে তাঁর সঙ্গে যোগদান করতে বললেন।

কিন্তু তাঁদের আগে আগেই বিপুল এক বাহিনী নিয়ে দিল্লীর দিকে আসতে লাগলেন স্বয়ং ঔরংজীব। উপায়ান্তর না দেখে দারা প্রস্থান করলেন লাহোরের দিকে, সঙ্গে রইল তাঁর দশহাজার সৈন্য।

দিল্লীতে পৌঁছে ঔরংজীব প্রথমে নিজেকে ভারত সম্রাট ব'লে ঘোষণা করলেন। তারপর যাত্রা করলেন লাহোরের দিকে।

দারা হতাশ ভাবে বললেন, "আমি ঔরংজীবকে বাধা দিতে পারব না। আর কেউ হ'লে এইখানে দাঁড়িয়েই তার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতুম।"

দারা আবার পলায়ন করলেন মুলতানের দিকে। সেখানেও পিছনে পিছনে এলেন সদলবলে ঔরংজীব। দারা মুলতান থেকে পালালেন সক্কর সহরের দিকে এবং তারপর কান্দাহারের পথে এবং তারপর আবার স্থান থেকে স্থানান্তরে।

এমন সময় খবর এল সুজা সসৈন্যে আগ্রার নিকটবর্তী হয়েছেন। দারার অবস্থা তখন একান্ত অসহায়, কারণ তাঁর অধিকাংশ সৈন্য হতাশ হয়ে তাঁর পক্ষ পরিত্যাগ করেছে। আপাততঃ কিছুকাল তিনি আর মাথা তুলতে পারবেন না বুঝে ঔরংজীব সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে সুজার বিরুদ্ধে করলেন যুদ্ধযাত্রা। কিছুদিনের জন্য দারা পেলেন রেহাই।

পর বৎসর—অর্থাৎ ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ। খাজোয়ার ক্ষেত্রে সুজাকে পরাজিত ও বিহারের দিকে বিতাড়িত ক'রে ঔরংজীব খবর পেলেন যে, দারা রাজস্থানে গিয়ে বাইশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ ক'রে আবার যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। তিনিও যাত্রা করলেন দারার উদ্দেশ্যে।

আজমীরের চার মাইল দক্ষিণে দেওরাই গিরিসঙ্কটের কাছে আবার দুই ভ্রাতার শক্তি পরীক্ষা হ'ল। এবারে দারা চারিদিক সামলে প্রাণপ্রণে যুঝে প্রথমটা ঔরংজীবকে বেশ কাবু ক'রেও শেষ পর্য্যন্ত আবার হার মানতে বাধ্য হ'লেন। এই হ'ল তাঁর শেষ প্রচেষ্টা। এর পর তিনি হয়ে পড়লেন একেবারেই নিঃস্ব ও শক্তিহারা।

তারপর দারা বাস্তহারার মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দেশে দেশে দিকে দিকে। কিন্তু তিনি যেখানেই যান, পিছনে লেগে থাকে শত্রুচর। প্রথমে তাঁর সঙ্গে ছিল দুই হাজার সৈনিক, কিন্তু ক্রমেই তারা দলে দলে বা একে একে অন্নকষ্ট, জলকষ্ট ও পথকষ্ট সইতে না পেরে তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে গেল।

নির্জ্জন মরুপ্রদেশ—তৃষ্ণায় সর্ব্বদাই প্রাণ টা-টা করে, খাদ্য মেলাও দুষ্কর। হিন্দুস্থানের যুবরাজ চলেছেন দুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ রোদে ধুঁকতে ধুঁকতে ও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে; তাঁর পরনে ময়লা সুতীর পোষাক, পায়ে আট আনা দামের জুতো, সঙ্গে আছে মাত্র একটি ঘোড়া, নারীদের ও মালপত্তর বহনের জন্য গুটিকয় উট এবং মাত্র কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর।

তারপর দুর্ভাগ্যের উপরে দুর্ভাগ্য! তাঁর রুগ্না সহধর্ম্মিনী ও বিশ্ববিখ্যাত আকবর বাদশাহের প্রপৌত্রী নাদিরা বানু আর কষ্ট সইতে না পেরে প্রাণত্যাগ করলেন। সে আঘাতে দারা একেবারেই ভেঙে পড়লেন। জীবন্মৃত অবস্থায় তিনি বোলান গিরিসঙ্কটের নিকটস্থ দাদার নামক স্থানের আফগান

জমিদারের কাছে পেলেন শেষ আশ্রয়। সে হচ্ছে ভয়াবহ আশ্রয়।

জমিদারের নাম মালিক জিওয়ান। কয়েক বৎসর আগে সম্রাট সাজাহান আদেশ দিয়েছিলেন, তাকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে মেরে ফেলা হোক্। কিন্তু যুবরাজ দারার প্রার্থনায় প্রাণদণ্ড থেকে সে অব্যাহতি লাভ করে।

বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ মালিক জিওয়ান প্রচুর পুরস্কারের লোভে তার প্রাণরক্ষক দারাকেই আজ নিঃসহায় অবস্থায় পেয়ে গ্রেপ্তার করে সমর্পণ করলে শত্রুপক্ষের হস্তে!

নবম

দারার নগর-ভ্রমণ

সম্রাট ঔরংজীব আদেশ দিয়েছেন, দিল্লীর রাজপথে আবালবৃদ্ধ-বনিতার সামনে মিছিল ক'রে দারাকে দেখিয়ে আনতে হবে!

একটা কর্দ্দমাক্ত ছোট মাদী হাতী তার পিঠের উপরে খোলা হাওদায় উপবিষ্ট পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী এবং সম্রাট সাজাহানের প্রিয়তম পুত্র দারা সুকো! ঠিক পাশেই ব'সে তাঁর চতুর্দ্দশ বর্ষীয় দ্বিতীয় পুত্র সিপির সুকো।

দারার পরনে ধূলিধূসরিত কর্কশ ও নিকৃষ্ট পোষাক, মাথায় অতি দীনদরিদ্রের উপযোগী ময়লা পাগড়ী, আজ তাঁর কণ্ঠে নেই আর রত্নহার। তাঁর হস্তযুগল মুক্ত বটে, কিন্তু পদযুগল শৃঙ্খলে আবদ্ধ। পিছনে ব'সে আছে নগ্ন কৃপাণ হস্তে কারারক্ষক নজর বেগ।

প্রচণ্ড সূর্য্য মাথার উপরে করছে অগ্নিবর্ষণ। দিল্লীর এই রাজপথই

একদিন দেখেছে যুবরাজ দারার সুখসৌভাগ্য ও বদান্যতা। অপমানে মাথা নুইয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে দারা নিশ্চেষ্ট ভাবে ব'সে রইলেন স্তম্ভিতের মত।

পথের ধার থেকে জনৈক ভিখারী কাতর কণ্ঠে ফুক্‌রে উঠল, "হে দারা, যখন তুমি প্রভু ছিলে, তখন সর্ব্বদাই আমাকে ভিক্ষা দান করতে। কিন্তু আজ আর তোমার দান করবার কিছু নেই।"

সেই সময়ে মাত্র একবার মুখ তুলে ভিখারীকে দেখে দারা নিজের কাঁধ থেকে আলোয়ানখানা খুলে তার দিকে নিক্ষেপ করলেন।

দারাকে হাস্যাস্পদ করবার জন্যই জনসাধারণের সামনে বার করা হয়েছিল। কিন্তু তার ফল হ'ল উল্টো। সেই বিপুল জনতার পুরুষ, নারী ও শিশুরা এমন তারস্বরে সম্মিলিত কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করতে লাগল, যেন তারা নিজেরাই পড়েছে কোন ভীষণ দুর্ভাগ্যের কবলে। দানশীলতার জন্য দারা ছিলেন জনতার মানসপুত্রের মত।

মিছিলের ভিতরে ক্রুদ্ধ জনতা বিশ্বাসঘাতক মালিক জিওয়ানকেও লক্ষ্য করেছিল। চরম অকৃতজ্ঞতার পুরস্কার স্বরূপ সে এখন লাভ করেছে সম্মানজনক বক্তিয়ার খাঁ উপাধি এবং একহাজার অশ্বারোহী সৈন্যের নায়কত্ব। কিন্তু মনে মনে গুমরেও কেউ তাকে কিছু বলতে সাহস করে নি, কারণ মিছিলের সঙ্গে অসংখ্য সশস্ত্র সৈনিক।

কিন্তু পরদিন নূতন খাঁ-সাহেব যখন নিজের দলবল নিয়ে ঔরংজীবের রাজসভায় যাচ্ছিল, ক্ষিপ্ত জনসাধারণ চারিদিক থেকে ছুটে এসে তাকে আক্রমণ করলে, তার কয়েকজন অনুচরকে মেরে ফেললে এবং তাকেও যে নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করত সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কেবল সদলবলে কোতোয়াল এসে পড়াতে কোনক্রমে সে প্রাণে বেঁচে গেল।

দশম

শেষ দৃশ্য

আবার হ'ল বিচার-প্রহসন। জ্যেষ্ঠ দারার উপরে প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন সেজো ভাই ঔরংজীব।

রাত্রিবেলা। পুত্র সিপির সেকোর সঙ্গে কারাগৃহে বসে ছিলেন দারা, এমন সময় সেখানে এসে দাঁড়াল সশস্ত্র নজর বেগ ও তার অনুচরেরা।

তাদের মুখ দেখেই দারা ব'লে উঠলেন, "বুঝেছি, তোমরা আমাকে হত্যা করতে এসেছ।"

নজর বেগ বললে, "না, আমরা সিপির সেকোকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

কিন্তু বালক সিপির বাবাকে ছেড়ে কিছুতেই যাবে না, সে কাঁদতে কাঁদতে দারার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। দারাও সক্রন্দনে পুত্রকে বদ্ধ করলেন আলিঙ্গনের মধ্যে, কিন্তু নির্ম্মম ঘাতকরা সিপিরকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে বাইরে চ'লে গেল।

দারা তখন একখানা কলম-কাটা ছুরি নিয়ে আততায়ীদের একজনকে আহত করলেন এবং অন্যান্য সকলের উপরেও করতে লাগলেন ঘন ঘন মুষ্টির আঘাত—ভেড়ার মত তিনি প্রাণ দিতে নারাজ!

কিন্তু একদল সশস্ত্রের সঙ্গে একজন নিরস্ত্রের যুদ্ধ কতক্ষণ চলতে পারে? দারার দেহের উপরে হ'তে লাগল ঘন ঘন শাণিত ছোরার আঘাত।

পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছিল সিপিরের যন্ত্রণাপূর্ণ তীব্র ক্রন্দনধ্বনি, কিন্তু তার মধ্যেই দারার কারাকক্ষ হয়ে পড়ল একেবারে নিস্তব্ধ। সেখানে ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে রক্তের লেখন, মেঝের

উপরে রক্তগঙ্গার ঢেউ, দিকে দিকে কেবল রক্ত আর রক্ত আর রক্ত! এবং এই বীভৎস ও ভয়াল রক্তোৎসবের মাঝখানে আড়ষ্ট হয়ে প'ড়ে আছে সম্রাটপুত্রের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ!

সিপিরের বুকফাটা কান্না আর থামল না। আজও পাষাণ-কারাগারের অন্দরে বন্দী হয়ে আছে সেই মৌন ক্রন্দনরব। প্রাণের কানে শোনা যায় সেই নীরব ক্রন্দন!

ওদিকে দাদার ছিন্ন মুণ্ড স্বচক্ষে না দেখে ঔরংজীব নিশ্চিন্ত হ'তে পারছিলেন না। তাঁর কাছে দারার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মুণ্ড প্রেরিত হ'ল।

সেই কাটা মুণ্ড দেখে ছোট ভাই ঔরংজীব কি বলেছিলেন, ইতিহাসে তা লেখা নাই। তবে তিনি যে কিছুমাত্র অনুতপ্ত হন নি, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়।

ছত্রপতির অ্যাডভেঞ্চার

এক

জেল-ভাঙার রঙ্গের

ভারতে 'ছত্রপতি' বললেই বুঝায় মহারাষ্ট্রের মহাবীর শিবাজীকে। কিন্তু যখনকার কাহিনী বলছি, তখনও তিনি 'ছত্রপতি' উপাধি ধারণ করেন নি।

বাদশাহ ঔরংজীবের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলেন ছত্রপতি শিবাজী। শিবাজীকে বধ করতে পারলে দিল্লীশ্বর নিশ্চিন্ত ও নিষ্কণ্টক হ'তেন, কিন্তু তাঁর সব অপচেষ্টাই হয়েছিল নিষ্ফল শেষ পর্য্যন্ত। তার প্রধান কারণ শিবাজীর বাহুবল নয়, বুদ্ধিবল।

ঔরংজীবের ফাঁদে পা দিয়ে শিবাজী তো বন্দী হলেন আগ্রা সহরে। তারপর তিনি কি অপূর্ব্ব কৌশলে মারাত্মক ফাঁদ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসেন, সে গল্প সকলেই জানেন, কারণ অনেক লেখক অনেকবার তা বর্ণনা করেছেন। সত্য যে উপন্যাসের চেয়ে অদ্ভুত, ঐ বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাহিনীটি সেই কথাই প্রমাণিত করে। ছেলেবেলায় রুদ্ধশ্বাসে গল্পটি পাঠ করতুম।

তারপরেই প'ড়ে যেত ছেদ! জেল ভেঙে অনেক কয়েদীই তো পালায়, কিন্তু তাদের অধিকাংশই পরে নাগালের বাইরে যাবার আগেই ধরা প'ড়ে সুড় সুড় ক'রে ফের জেলে ঢুকতে বাধ্য হয়, এই ব্যাপারটাই দেখা গেছে বারংবার।

দিল্লী থেকে মহারাষ্ট্র—বহু দূর। তার মধ্যে দিকে দিকে কড়া পাহারা দিচ্ছে হাজার হাজার সতর্ক প্রহরী। শিবাজী কেমন ক'রে তাদের চোখে দিলেন ধুলো, ছেলেবেলায় তা জানবার জন্যে মনে

জাগত ব্যাকুল প্রশ্ন। কিন্তু ইস্কুলের ইতিহাসে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত না।

আজকের ছেলেমেয়েরাও নিশ্চয়ই মনে মনে এই প্রশ্ন করে। তাদের কৌতূহল নিবারণের জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

এ হচ্ছে রীতিমত চিত্তোত্তেজক অ্যাডভেঞ্চার।

দুই

দক্ষিণের যাত্রী উত্তরে

আগ্রা থেকে কয়েক মাইল দূরে এক বিজন অরণ্য।

সেইখানে বসল পলাতকদের পরামর্শ-সভা। অবশেষে স্থির হ'ল পাছে ভারী দল দেখে লোকের সন্দেহ জাগে, তাই দলের অন্যান্য সকলে যাবেন একদিকে এবং শিবাজী তাঁর বালক-পুত্র শম্ভুজী ও তিনজন পদস্থ কর্ম্মচারীকে নিয়ে যাত্রা করবেন অন্যদিকে।

শিবাজী ও তাঁর সঙ্গীরা সর্ব্বাঙ্গে ছাই মেখে সাজলেন ভবঘুরে সন্ন্যাসী, তারপর অগ্রসর হলেন মথুরার পথে।

ওদিকে আগ্রায় বন্দীর ঘর শূন্য দেখে প্রহরীদের সর্দ্দার ফুলাদ খাঁ হন্তদন্ত হয়ে সম্রাটের কাছে গিয়ে কুর্ণিশ ঠুকে খবর দিলে—"জাঁহাপনা, শিবাজী-রাজা যে নিজের ঘরেই আটক ছিলেন, এ আমরা বারবার উঁকি মেরে স্বচক্ষে দেখেছি। তারপর আচমকা আমাদের চোখের সামনেই তিনি মিলিয়ে গেলেন কোথায় কে জানে! তিনি পাখীর মত ফুড়ুক্ ক'রে আকাশে উড়ে পালালেন, না মাটি ফুঁড়ে পাতালে ঢুকে গেলেন, না অন্য কোনরকম ভানুমতীর খেল্ খেল্‌লেন, সে সব কিছুই বোঝা গেল না!"

কিন্তু এ হেন গাঁজাখুরি গল্পে বিশ্বাস করবেন, ঔরংজীব মোটেই

সে-পাত্র ছিলেন না। হৈ-হৈ রব উঠল তখনি! শিবাজীর পলায়ন-বার্ত্তা নিয়ে দলে দলে দূত ব্যস্তভাবে ছুটে গেল দিকে দিকে! দাক্ষিণাত্যে যাবার প্রত্যেক পথ আগলে সজাগ হয়ে রইল হাজার হাজার সেপাই-সান্ত্রী।

কিন্তু চাতুর্য্যে শিবাজীকে ঠকাবে কে? তিনি মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা, তাঁর গন্তব্যপথ ভারতের দক্ষিণদিকেই বটে। তবে সেদিকের পথের উপরে থাকবে যে প্রহরীদের শ্যেনদৃষ্টি, সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না কিছুমাত্র।

অতএব তিনি মাথা খাটিয়ে ধরলেন উত্তর-ভারতের পথ। আগ্রা ছেড়ে ঘণ্টা ছয় পরে পদব্রজে পৌঁছলেন গিয়ে মথুরায়, কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারলে না।

কিন্তু ছেলেমানুষ শম্ভুজী, মথুরা পর্য্যন্ত গিয়ে পথশ্রমে একেবারে ভেঙে পড়ল।

এও এক গুরুতর সমস্যা। অক্ষম ছেলের মুখ চেয়ে সেখানে অপেক্ষা করলে বাদশাহের গোয়েন্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে এবং অক্ষম পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যাবারও উপায় নেই। এখন মুস্কিল আসান হয় কেমন ক'রে?

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেখানে ছিল শিবাজীর তিনজন জানিত লোক, তাঁদের হাতেই পুত্রকে সমর্পণ করে আবার তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

ইতিমধ্যেই শিবাজী গোঁপদাড়ি কামিয়ে ফেলেছিলেন। পথে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু তাও অতি গোপনে না নিয়ে গেলে চলবে না। অতএব তিনি হাতে নিলেন এমন এক মোটা লাঠি—ভিতরটা যার ফাঁপা। কিন্তু সেই শূন্যগর্ভ যষ্টির ভিতরটা পূর্ণ রইল বহু অমূল্য রত্ন ও স্বর্ণমুদ্রায়। আরো কিছু ঐশ্বর্য্য লুকিয়ে রাখা হ'ল পাদুকার মধ্যে।

হীরা-চুণির উপরে মোমের প্রলেপ মাখিয়ে শিবাজীর ভৃত্যরাও মুখের ও পোষাকের ভিতরে লুকিয়ে রাখলে।

তারপর দিনের বেলায় বিশ্রাম ও রাতের অন্ধকারে পথ চলা। শিবাজীর অনুচররা তিন দলে বিভক্ত হয়ে বৈরাগী, গোঁসাই ও উদাসী এই তিন শ্রেণীর সন্ন্যাসীর ভেক ধারণ করে পিছনে পিছনে চলল। সংখ্যায় ছিল তারা পঞ্চাশ-ষাটজন।

মাঝে মাঝে ছদ্মবেশ পরিবর্ত্তনেব প্রয়োজন হ'ত। পলাতকরা কখনো সাজতেন ভিক্ষাজীবী সাধু, কখনো বা নিম্নশ্রেণীর সওদাগর। এক তীর্থক্ষেত্রে যারা তাঁদের দেখেছে, তারা অন্য তীর্থক্ষেত্রে তাঁদের চিনতে পারত না।

মথুরা ছেড়েও শিবাজী দেশমুখো হলেন না—চললেন পূর্ব্বদিকে। একে একে গেলেন এলাহাবাদ, বেনারস ও গয়াধামে, তাঁকে সাধারণ তীর্থযাত্রী ছাড়া আর কিছু ব'লে ভ্রম করবার উপায় রইল না।

এ-সব অঞ্চলেও যথাসময়ে বাদশাহের ফরমান এসেছে বটে, কিন্তু মহারাষ্ট্রের যাত্রীর আসবার কথা নয় পূর্ব্বভারতের দিকে, তাই দক্ষিণাপথের মত এদিককার কর্ত্তৃপক্ষও যে খুব বেশী হুঁশিয়ার ছিলেন না, সেটুকু সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এবং শিবাজীও চেয়েছিলেন তাই!

তবু মাথার উপরে মাঝে মাঝে নেমে এসেছিল বিপদের ফাঁড়া। এইবারে সেই কাহিনীই বলব। সে-সব যেন চমকদার ডিটেকটিভ উপন্যাসের ঘটনা।

তিন

লক্ষটাকার মহিমা

সহরের ফৌজদারের নাম আলি কুলি। সন্ন্যাসীর বেশে শিবাজী সদলবলে প্রবেশ করলেন সেই শহরে।

বাদশাহের ফরমান জাগ্রত ক'রে তুলেছে ফৌজদারকে। শিবাজী ও তাঁর দলবলের হাবভাব সন্দেহজনক মনে হওয়াতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হ'ল এবং বন্দীদের নিয়ে জোর জেরা চলতে লাগল।

বোধকরি বন্দীদের পক্ষে জেরার ফল হ'ল না বিশেষ সন্তোষ-জনক। গতিক সুবিধার নয় বুঝে শিবাজী ফৌজদারের সঙ্গে গোপনে দেখা করলেন।

তখন দুপুর রাত। বন্দী বললেন, "আমি শিবাজী।"

সচকিত ফৌজদার বুঝলেন, তাঁর জালে পড়েছে সবচেয়ে সেরা ঘাগী মাছ। আশা করা যায় বন্দীর পরিচয় পেয়ে তাঁর বুক হয়ে উঠেছিল দশ হাত।

শিবাজী বললেন, "যদি আমাকে মুক্তি দেন, আমার কাছ থেকে আপনি লাখটাকা দামের একখানা হীরা ও একখানা পদ্মরাগ মণি উপহার পাবেন।"

পরম লোভনীয় উৎকোচ—একেবারে কল্পনাতীত। বুদ্ধিমান ফৌজদার এমন দুর্লভ সুযোগ ত্যাগ করতে পারলেন না।

আলি কুলি কর্ত্তব্য ভুললেন এবং শিবাজী সদলবলে নিরাপদে আবার পদচালনা করলেন নিজের গন্তব্য পথে।

চার

মুষ্টিগত সৌভাগ্য

এলাহাবাদ। গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম। স্মরণাতীত কাল থেকে তীর্থযাত্রীরা এখানে এসে অবগাহন-স্নান এবং শাস্ত্রকথিত অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম পালন ক'রে থাকেন। শিবাজীও সেখানে স্নানাদি সেরে যাত্রা করলেন কাশীধামের দিকে।

পুণ্যতীর্থ বারাণসী—ভারতের বর্ত্তমান নগরগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন। য়ুরোপে যখন কেউ রোমের নামও শোনেনি, তখনও বারাণসীর খ্যাতি দিকে দিকে দেশ-বিদেশে বিস্তৃত।

চারিদিকে তরুণ উষার আলো-আঁধারির খেলা। নিষ্ঠাবান হিন্দুর মত শিবাজীও তীর্থ-কৃত্য পালন করতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময়ে সম্রাটের বার্ত্তাবহ নগরে ঢুকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলে—রাজা শিবাজী পলাতক! অবিলম্বে তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে!

ঠিক তার একটু আগেই শিবাজী জনৈক পূজারীর হাতের মধ্যে কিছু ধনরত্ন গুঁজে দিয়ে বলেছেন—"এখন মুঠো খুলো না, শীঘ্র আগে আমাকে শাস্ত্রীয় বিধি পালন করাও!"

ইতিমধ্যে শিবাজী ক্ষৌরকার্য্য ও স্নান সেরে নিয়েছেন, কিন্তু তখনও তাঁর অন্যান্য কর্ত্তব্য শেষ হয়নি। ঠিক সেই সময়ে রাজদূতের ঘোষণা তাঁর কর্ণগোচর হ'ল······

পুরোহিত ফিরে দেখেন, তাঁর যজমান অদৃশ্য!

হাতের মুঠো খুলে তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, নয়খানি রত্ন এবং কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা!

শিবাজীর কাছ থেকে প্রাপ্ত এই দৌলতের প্রসাদে পুরোহিত পরে হয়েছিলেন প্রাসাদোপম ভবনের অধিকারী।

পাঁচ

বেশী দাম দেওয়ার বিপদ

পূর্ব্বে—আরো পূর্ব্বে—দক্ষিণের যাত্রী চলেছেন আরো পূর্ব্বদিকে, ধূলিনিক্ষেপ করতে হবে বাদশাহের গুপ্তচরদের ক্ষুধিত চক্ষে!

কাশীধাম থেকে তাড়া খেয়ে শিবাজী ক্রোশের পর ক্রোশ পার হয়ে গেলেন দ্রুতপদে। অবশেষে গয়াধামে। সেখানে অর্ঘ্য নিবেদন করলেন বিষ্ণুর পাদপদ্মে।

তারপরেই আছে বঙ্গদেশ। কিন্তু বঙ্গদেশ তীর্থের জন্যে ভারত-বিখ্যাত নয়। এবং সম্রাটের গোয়েন্দারাও দক্ষিণাপথে মিথ্যা ছুটোছুটি ক'রে শ্রান্ত হয়ে এতদিনে শিবাজীর আশা নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করেছে! আলেয়ার পিছনে ছোটারও মানে হয়, কারণ তাকে দেখা যায়; কিন্তু যে থাকে একেবারে চোখের আড়ালে, তার পাত্তা পাওয়া যাবে কেমন ক'রে?

অতএব এইবারে এসেছে স্বদেশ প্রত্যাগমনের প্রশস্ত সুযোগ।

শিবাজী এবারে অগ্রসর হ'লেন বিহার থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। সুদূর পথ—ভারতের প্রায় এক প্রত্যন্ত দেশ থেকে আর এক প্রান্তে। মাঝে পড়ে বিস্তর নদনদী, দুস্তর প্রান্তর, দুশ্চর অরণ্য, দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত, বিপদজনক জনপদ। পায়ে হেঁটে ক্রোশের পর ক্রোশ পার হ'তে হ'তে পা ওঠে টনটনিয়ে, গায়ে হয় ব্যথা। শিবাজী ছিলেন অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণে অভ্যস্ত, পদব্রজে পথ অতিক্রম করতে আর তাঁর ভালো লাগল না।

অতএব পথিমধ্যে একজায়গায় দরদস্তুর ক'রে তিনি একটি টাট্টু ঘোড়া কিনে ফেললেন।

সঙ্গে রৌপ্যমুদ্রার অভাব, তাই তিনি জেব থেকে থলি বার ক'রে অশ্ব-ব্যবসায়ীর হাতে সমর্পণ করলেন কয়েকটি মোহর।

অশ্ব-ব্যবসায়ীর বিস্ময়ের সীমা রইল না। বলা বাহুল্য, তখন শিবাজীর অদ্ভুত পলায়ন-বার্ত্তা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে। সে সচমকে ব'লে উঠল, "একটা ছোট টাট্টু ঘোড়ার জন্যে আপনি এত বেশী দাম দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই আপনি শিবাজী-রাজা!"

ব্যবসায়ীর মুখ চট্‌পট্‌ বন্ধ করবার জন্যে মোহর-ভর্ত্তি থলিটাই তার হাতে ফেলে দিয়ে শিবাজী তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে সেখান থেকে স'রে পড়লেন।

ছয়

দস্যু শিবাজী ও কৃষাণ পরিবার

গোদাবরী নদীতীরের এক গ্রাম। ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর দল সেখানকার কোন চাষীর বাড়ীতে গিয়ে অতিথি হ'ল।

চাষীর বুড়ী মা দুঃখ করে বললে, "কি বলব বাবা, সর্ব্বস্ব গিয়েছে, আর কি আমাদের অতিথি সৎকার করবার সামর্থ্য আছে?"

কৌতূহলী শিবাজী সুধোলেন, "কেমন ক'রে সর্ব্বস্ব গেল মা?"

বুড়ী বললে, "শিবাজী-ডাকাতের চ্যালা-চামুণ্ডারা গোটা গাঁ লুঠ ক'রে গেছে, আমাদেরও কিছু রেখে যায়নি।" তারপর সে লুঠেরাদের দলপতি শিবাজীর উদ্দেশে চোখা চোখা বাক্যবাণ বর্ষণ করতে লাগল।

শিবাজী চেপে গেলেন তখনকার মত। কিন্তু সেই কৃষাণ পরিবারের নাম ও ঠিকানা মনে রাখতে ভুললেন না।

পরে যথাসময়ে দেশে ফিরে তিনি সেই কৃষককে সপরিবারে নিজের

কাছে তলব ক'রে আনিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই তারা এসেছিল খুব ভয়ে ভয়ে, কিন্তু বাড়ী ফিরেছিল ভারি হাসিমুখে, শিবাজীর মঙ্গলকামনা করতে করতে।

কেন, তাও কি আবার খুলে বলতে হবে ?

সাত

জিজাবাইয়ের শিবা

উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম ঘুরে অবশেষে দক্ষিণে! রীতিমত ভারত-পরিক্রমা! দিগ্বিজয়ী রূপে নয়, মহাবীর হয়েও ভাগ্যহত, শক্রভীত অভাগাজনের মত শিবাজী আজ বৃহৎ ভারতের যে-অংশের মাটি মাড়িয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন, অদূর-ভবিষ্যতে তাঁরই সৃষ্ট সৈন্যসামন্তগণ যে সেই বিপুল ভূখণ্ডেরই দিকে দিকে গৈরিক পতাকা উড়িয়ে বিজয়োৎসবে প্রমত্ত হয়ে উঠবে, এ কথা কেউ সেদিন কল্পনায়ও আনতে পারেনি। একান্ত অকালে পূর্ণগৌরবের মাঝখানে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার আগেই মাত্র তেত্রিশ বৎসরের মধ্যেই নিজের হাতে তিনি এমন এক দুর্দ্ধর্ষ জাতি তৈরি ক'রে গিয়েছিলেন, যার কাছে সকল গর্ব্ব হারিয়ে সকাতরে করুণা ভিক্ষা করতে হয়েছিল একদা-অপরাজেয়, শক্তিগর্ব্বিত মোগল রাজবংশকেও। স্বর্ণ ও রত্নখচিত ময়ূর সিংহাসনে আসীন হয়ে সেদিন যে আলমগীর ঘৃণার্হ শিবাজী, মারাঠী ও সেই সঙ্গে সমগ্র হিন্দুজাতির উচ্ছেদ সাধনের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে গিয়েছিলেন, পরে সেই আলমগীর নামেই পরিচিত দ্বিতীয় দিল্লীশ্বর মারাঠীদেরই আশ্রয়গ্রহণ করতে লজ্জিত হননি এবং তখন তাঁর মসনদ বলতে বোঝাত কাঠে তৈরী এক নকল ময়ূর সিংহাসন! আবার তারও

বৎসর দুই পরে ঐ মারাঠীরাই গায়ের জোরে দখল করেছিল রাজধানী দিল্লী পর্য্যন্ত !

কিন্তু সে সব হচ্ছে আরও কিছুকাল পরের কথা। আপাততঃ ঔরংজীবের লক্ষ্যচ্যুত শিবাজী কোনক্রমে নিজের কোটে পদার্পণ ক'রে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। কালচক্র ঘুরে যাবে কোন্‌দিকে, তিনি বা ঔরংজীব কেহই তা এখন পর্যন্ত জানতে পারেননি······

বীরধাত্রী, রত্নপ্রসবিত্রী, পুত্রগত-প্রাণা জিজাবাই ! নিজেব হাতে মানুষের-মত-মানুষ-করা ছেলে আজ হিন্দুবিদ্বেষী, কূটচক্রী, নৃশংস ঔরংজীবের খপ্পরে গিয়ে পড়েছে, তাই শিবাজী-জননীর জীবন হয়ে উঠেছে দুঃসহ দুঃস্বপ্নের মত।

একাকিনী ব'সে ব'সে তিনি নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করছেন, এমন সময়ে দ্বারী এসে খবর দিলে, একদল বৈরাগী তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। তিনি সম্মতি দিলেন।

সন্ন্যাসীরা সামনে এসে দাঁড়াল। একজন হাত তুলে তাঁকে আশীর্ব্বাদ করলে। কিন্তু আর একজন এগিয়ে এসে লুটিয়ে পড়ল একেবারে তাঁর পায়ের তলায় !

জিজাবাই বিস্মিত ও তটস্থ ! কোন সন্ন্যাসী যে তাঁর পায়ে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম কববে, এ যে স্বপ্নাতীত ! এ যে অমঙ্গলকর !

তারপর সন্ন্যাসী মাথা রাখলে একেবারে তাঁর কোলের ভিতরে এবং একটানে খুলে ফেললে নিজের শিরস্ত্রাণ !

মাথার একটা পরিচিত চিহ্ন দেখেই জিজাবাইয়ের বুঝতে দেরি হ'ল না যে, তাঁর কোলের ছেলেই আবার ফিরে এসেছে মায়ের কোলে ! দুই হাতে তাকে জাড়িয়ে ধ'রে তিনি আবেগকম্পিত কণ্ঠে ডাকলেন, "শিবা, শিবা, আমার শিবা !"

আদরে গ'লে শিবাজী সাড়া দিলেন, "মা গো, আমার মা !"

"শিবা, শিবা, আমার শিবা

বাংলাদেশে বোম্বেটেরাজ

এক

চলতি বাংলায় জলদস্যুকে বলা হয়, বোম্বেটে। ইংরেজীতে বলে Pirate—ও শব্দটি এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। বাংলা 'বোম্বেটে' কথাটির উৎপত্তি পর্তুগীজ শব্দ থেকে, তার কারণ একসময়ে পর্তুগীজ জলদস্যুদের বিষম অত্যাচারে বাংলা দেশের অনেক জায়গাই প্রায় জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। বোম্বেটে বলতে লোকে বুঝত তখন প্রধানতঃ পর্তুগীজদেরই।

Pirate শব্দটির উৎপত্তি যখন প্রাচীন গ্রীক ভাষা থেকে, তখন বুঝতে হবে যে খৃষ্ট-পূর্ব যুগেও গ্রীসদেশের জলপথে ছিল বোম্বেটেদের উৎপাত। কেবল গ্রীস কেন, রোম, মিশর, ভারতবর্ষ ও চীন প্রভৃতি প্রত্যেক প্রাচীন দেশকেই স্মরণাতীত কাল থেকে জলদস্যুদের মারাত্মক উপদ্রবের জন্যে বর্ণনাতীত যন্ত্রণাভোগ করতে হয়েছে।

এক শ্রেণীর ডানপিটে লোক দুঃসাহসিক কাজ ক'রে আনন্দ পায়। তার উপরে থাকে যদি প্রচুর অর্থলাভের প্রলোভন, তাহ'লে তো আর কথাই নেই। অনেক তথাকথিত সাধুও তখন আর সয়তান হয়ে উঠতে লজ্জা পায় না। আর এ কথাও সকলেই জানে যে, মনুষ্যসমাজে সয়তানের দলই প্রবল।

স্থলপথে সতর্ক পাহারা। সশস্ত্র সৈনিক, জাগ্রত জনতা, পদে পদে আইনের বাধা। চম্পট দেবার আগেই চট্‌পট্ ধরা পড়বার সম্ভাবনা।

জলপথেও আইনবিরুদ্ধ কাজ ক'রে ধরা পড়লে শাস্তি পেতে হয়।

কিন্তু আগেকার যুগে স্থলপথের মত জলপথেও উচিতমত পাহারা দেবার ব্যবস্থা ছিল না। বিশেষতঃ অসীম সাগরে। জলদস্যুরা লুটপাট ক'রে কোথায় ডুব মারত, তাদের গ্রেপ্তার করবার আশা ছিল সুদূরপরাহত। বার বার দেখা গেছে, ভারত সাগরে বোম্বেটেদের অত্যাচার হয়ে উঠেছে মারাত্মকরূপে ভয়াবহ, অথচ "সর্ব্বশক্তিমান" উপাধিধারী দিল্লীর বাদশাহও তাদের নাগাল ধরতে পারছেন না। এই সব কারণে বোম্বেটেদের প্রাধান্য ছিল বিশেষ ক'রে সেকালেই।

একালেও বোম্বেটে হ'তে চায়, এমন সব দুরাত্মার অভাব নেই। কিন্তু স্থলে সৈন্যবাহিনীর মত জলে রাজার নৌবাহিনীও এতটা প্রবল হয়ে উঠেছে যে, বোম্বেটেগিরি আর নিরাপদ ও লাভজনক নয়। বোম্বেটেরা আর সশস্ত্র ও দ্রুতগামী যুদ্ধ জাহাজের অধিকারী হ'তে পারে না এবং প্রত্যেক দেশে থাকে ঐ শ্রেণীর শত শত সরকারি জাহাজ। আজকাল তাই সহজেই দমন করা যায় জলদস্যুতা। একমাত্র চীন সমুদ্র ছাড়া আর কোথাও আজ জলদস্যুতার কথা শোনা যায় না।

কিন্তু যে জলপথে হানা দিতে চায়, রণতরীর অধিকারী হ'লে সে যে কি সাংঘাতিক হুলস্থুল বাধিয়ে দিতে পারে, গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে "এমডেন" জাহাজের জার্ম্মান কাপ্তেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ রেখে গিয়েছেন। দিনের পর দিন দীর্ঘকাল ধ'রে এমডেন বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল দিকে দিকে, কিন্তু সমগ্র ভারতসাগরে দিশেহারার মত ছুটোছুটি ক'রেও তার পাত্তা পায়নি ইংরেজদের দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধজাহাজগুলো।

জলদস্যুতা বেআইনি হ'লেও তার সঙ্গে আছে রোমান্সের সম্পর্ক। দেশ-বিদেশের সমুদ্রে ও নদনদীতে অর্থ আর রক্ত লোভী সেই বেপরোয়া মানুষদের রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়তে ভালোবাসে ছেলে-বুড়ো সকলেই। তাদের কথা নিয়ে রচিত হয়েছে
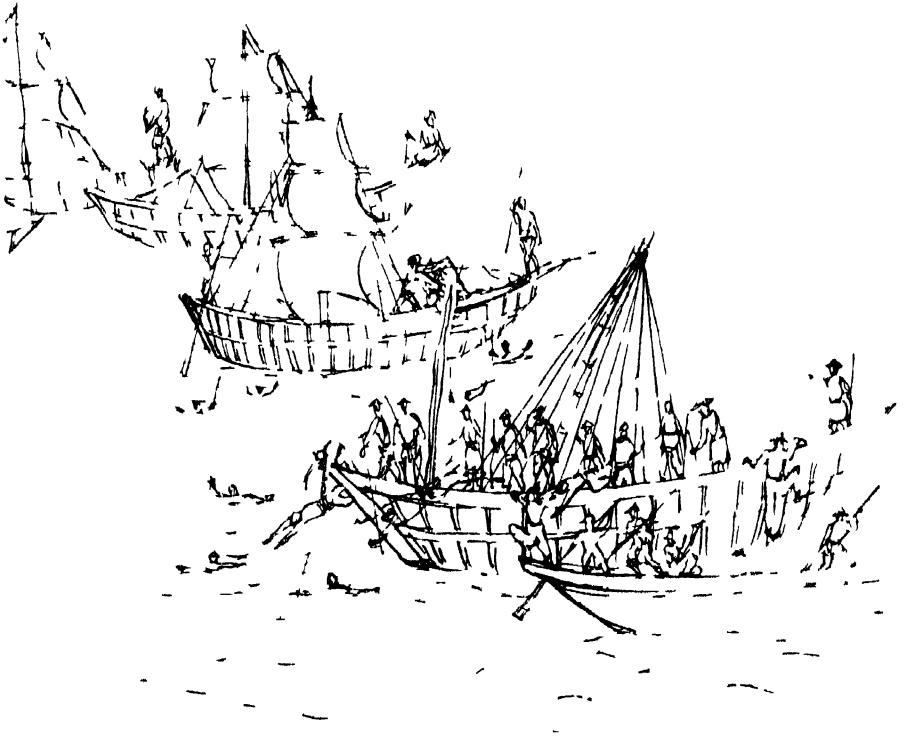
অসংখ্য গল্প ও শত শত উপন্যাস এবং তাদের চাহিদা আছে সমগ্র পৃথিবীতে। তবে কেবল হানাহানি, রক্তারক্তি ও লুটতরাজের জন্যে নয়, সে সব কাহিনী অধিকতর চিত্তোত্তেজক হয়ে ওঠে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে যখন নায়ক রূপে দেখা দেয় এক একজন সাধু ব্যক্তি।

কিন্তু আজ আমি তোমাদের কাছে যে সব দুষ্ট লোকের কথা বলতে বসেছি, তারা কল্পিত গল্প উপন্যাসেব কেউ নয়, রক্তমাংসের দেহ নিয়ে বিদ্যমান ছিল তারা সত্যিকার পৃথিবীতেই। জাতে তারা হচ্ছে মগ বা আরাকানী ও ফিরিঙ্গী বা পর্ত্তুগীজ। তাদের পেশা ছিল বাংলাদেশের নদীতে নদীতে জলদস্যুতা করা। সে সব হচ্ছে প্রধানতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর ব্যাপার।

আরো কয়েকশত বৎসর পিছিয়ে গেলে আমরা উপলব্ধি করতে পারব আর একটি পরম সত্য।

ভারতের মাটিতে মুসলমানরা প্রথম শিকড় গাড়বার সুযোগ পেয়েছিল কেন ?

উত্তরে ইতিহাস বলবে, বোম্বেটেদের জন্যেই।

পশ্চিম এশিয়ার কতক অংশ তখন আরবদের করতলগত। মুসলমানদের ধর্ম্মনেতা ও নরপতি বা খলিফার অধীনে হাজাজ ছিলেন ইরাকের শাসনকর্ত্তা।

সিংহলের রাজা ঐ খলিফা ও হাজাজের উদ্দেশে পাঠিয়েছিলেন বহুমূল্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ নয়খানা জাহাজ।

জাহাজগুলো অগ্রসর হচ্ছিল সিন্ধুদেশের নিকটস্থ সাগরপথ দিয়ে। আচম্বিতে একদল জলদস্যু (খুব সম্ভব তারা ভারতীয়) সেই সব জাহাজ লুণ্ঠন ক'রে স'রে পড়ল।

সিন্ধুদেশের রাজা তখন দাহীর। মূল্যবান সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত

হয়ে হাজাজ দূত পাঠিয়ে দাহীরকে বললেন, "এর জন্যে ক্ষতিপূরণ করতে ও দস্যুদের শাস্তি দিতে হবে আপনাকেই।"

দাহীর বললেন, "সে কি কথা ? দস্যুরা তো আমার হাতধরা নয়, আমি তাদের শাস্তি দেব কেমন ক'রে ?"

এ যুক্তি হ'লনা হাজাজের মনের মত। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি দাহীরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন সৈন্যদল এবং প্রথম যুদ্ধে হেরে ও দ্বিতীয় যুদ্ধে জিতে হাজাজ সিন্ধুদেশ অধিকার করলেন।

সেই হ'ল ভারতে মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত। সেটা হচ্ছে ৭১২ খৃষ্টাব্দের কথা।

দুই

বাংলাদেশে বোম্বেটেরা যখন দস্তুরমত পসার জমিয়ে তুলেছে, সেই সময়ে য়ুরোপে ও আমেরিকাতেও সকলকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারছিল জলদস্যুরা। আগে সংক্ষেপে তাদেরও কিছু কিছু পরিচয় দিয়ে রাখি, কারণ ঐ ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদেরই একদল হয়েছিল ভারতীয় জলপথের পথিক।

আগেই বলেছি, গ্রীক ও রোমানদের সময়েও য়ুরোপে জলদস্যুর অভাব ছিল না। বিশ্ববিখ্যাত দিগ্বিজয়ী জুলিয়াস সিজারকেও একবার জলদস্যুর কবলে প'ড়ে বিস্তর নাস্তানাবুদ হ'তে হয়েছিল।

রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর উত্তর আফ্রিকার মুসলমান জলদস্যুরা ভূমধ্য সাগরে অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। পনেরো শতাব্দীর শেষভাগে স্পেন থেকে বিতাড়িত হয়ে মুসলমানরা উত্তর-আফ্রিকার মরক্কো প্রভৃতি প্রদেশে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তারপর তাদের অনেকে জলদস্যুর পেশা নিয়ে য়ুরোপীয়দের উপরে অবাধ অত্যাচার চালাতে

থাকে। তাদের বিপুল প্রতাপে সারা য়ুরোপ হ'ত থরহরি কম্পমান। তারা কেবল সমুদ্রযাত্রীদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিত না, মানুষদেরও ধ'রে নিয়ে গিয়ে গোলাম ক'রে রাখত—এই ভাবে হাজার হাজার য়ুরোপীয়কে চিরজীবনের জন্য বন্দী হয়ে থাকতে হ'ত। তারা ক্রমে ক্রমে এমন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, সমগ্র য়ুরোপের বিভিন্ন রাজ্য একত্রে চেষ্টা ক'রেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত তাদের দমন করতে পারে নি। খৈর এদ্-দিন, ড্রাগুত্ ও আলি বাসা প্রভৃতি বোম্বেটের নাম শুনলেই তখনকার য়ুরোপীয় বণিকদের পেটের পিলে চমকে উঠত। একদিক দিয়ে বাংলাদেশের ফিরিঙ্গী বোম্বেটেরাও ছিল তাদের সুযোগ্য ছাত্র। সে কথা বলব যথাসময়ে।

ভূমধ্যসাগরে মুসলমান বা মুর-জাতীয় বোম্বেটেরা আর সকলের উপরে টেক্কা মেরেছিল বটে, কিন্তু তা ব'লে মনে করোনা যে, নানাদেশীয় য়ুরোপীয় জলডাকাতরা হাত গুটিয়ে চুপ করে বসেছিল নিতান্ত ভালমানুষের মত। সুবিধা পেলেই তারা প্রাণপণে উৎপাত করত যেখানে সেখানে। নিম্নশ্রেণীর সাধারণ জলডাকাতরা তো ছিলই, তার উপরে আত্মপ্রকাশ করে নূতন একশ্রেণীর বোম্বেটে। জাতে তারা ইংরেজ, এবং অনেক সময়ে ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানরাও তাদের দলে যোগ দিতে ইতস্ততঃ করত না। ইংরেজ ছাড়া আর সব জাতের জাহাজ তারা নির্ব্বিচারে লুণ্ঠন করত।

ক্রমে য়ুরোপীয় বোম্বেটের দল দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরদিকে আছে ক্যারিবিয়ান সমুদ্র, তা হচ্ছে আট-লান্টিক মহাসাগরেরই একটি শাখা। ঐখানেই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলটা ছিল ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদের জন্যে অত্যন্ত কুখ্যাত। তাদের নির্দ্দয়তা ছিল মর্ম্মভেদী। তারা কেবল জাহাজ লুণ্ঠন ক'রেই ক্ষান্ত হ'ত না,

সর্ব্বস্ব কেড়ে নেবার পর যাত্রীদেরও অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বাধ্য করত। এই ভাবে কত হাজার হাজার অভাগাকেই যে জীবন্ত অবস্থাতেই সলিলসমাধি লাভ করতে হয়েছে, তার হিসাব কেউ রাখতে পারে নি।

নতুন এক ওজুহাত দেখিয়ে সমুদ্রে জাহাজ ভাসালে আর এক শ্রেণীর ইংরেজজাতীয় জলদস্যু। তখন ইংলণ্ডের সঙ্গে স্পেনের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ চলেছে। সে সময়ে স্পেনের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল আমেরিকার নানা স্থানে। ইংরেজ বোম্বেটেরা সুবিধা পেলেই স্পেনের কোন জাহাজই লুণ্ঠন করতে ছাড়ত না। এত বড় তাদের বুকের পাটা ছিল যে, সরকারি যুদ্ধজাহাজের সঙ্গেও তারা লড়াই করতে ভয় পেত না। কেবল সমুদ্রে নয়, প্রায়ই তারা ডাঙ্গায় নেমে বড় বড় অরক্ষিত নগরকেও আক্রমণ করত! সে এক বিষম সর্ব্বনেশে ব্যাপার—লুঠতরাজের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিকাণ্ড ও হত্যাকাণ্ড! তাদের কবলে প'ড়ে বহু শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ জনপদ পরিণত হয়েছে প্রাণীশূন্য ভস্মস্তূপে। লাভের লোভে এদের দলে যোগ দিয়েছিল ফরাসী বোম্বেটেরাও। ইংরাজীতে এদের এক নূতন নামকরণ হয়েছে—বাক্যানীয়ার (Buccaneer)। এই দলের কাপ্তেন বার্থো-লোমিউ রবার্টস নামে একজন ডাকাত একাই লুণ্ঠন করেছিল চারিশত জাহাজ। এ ছাড়া কীড্, টীচ্ ও লোলোনয়েজ্ প্রমুখ প্রসিদ্ধ বোম্বেটেরাও হিংস্রতা ও ভীষণতার জন্যে অতিশয় কুখ্যাত হয়ে আছে।

স্বার্থের গন্ধ পেয়ে নীতিজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট পর্যন্ত। "আমি স্পানিয়ার্ডদের সঙ্গে লড়াই করেছি" বললেই অত্যন্ত নরাধম যে কোন জলডাকাতের সাত খুন মাফ হয়ে যেত। হেনরি মর্গ্যান নামে এই দলের এক পাপাত্মাকে বন্দী ক'রে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে

দেওয়া হয়েছিল—শাস্তিলাভ করবার জন্যে। ইংরেজের আইনে বোম্বেটের শাস্তি হচ্ছে, প্রাণদণ্ড। কিন্তু তখনকার ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস মর্গ্যানকে বোম্বেটে জেনেও "স্যর" উপাধিতে ভূষিত ক'রেও তৃপ্ত হলেন না, তাকে লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর রূপে পাঠিয়ে দিলেন জামাইকা দ্বীপে। ভক্ষক হ'ল রক্ষক !

তিন

ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদেরই এক দলের কার্য্যক্ষেত্র হ'ল বঙ্গদেশ। ঐ দলে য়ুরোপের অন্যান্য জাতির লোকও ছিল, হানা দিয়ে বেড়াত তারা ভারতসাগরে। কিন্তু তাদের মধ্যে সব চেয়ে মাথা চাগাড় দিয়ে উঠল পর্ত্তুগীজরাই।

তার কারণও আছে। সমুদ্রপথে তখন পর্ত্তুগালের প্রভুত্বের সীমা নেই। পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা য়ুরোপ থেকে ভারতে আসবার জন্যে নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কার ক'রে মস্ত নাম কিনেছেন। আমরা তাঁকে যদি ভদ্রবংশীয় বোম্বেটে ব'লে ডাকি, তবে কিছুমাত্র অন্যায় হবে না। কারণ ১৫০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের কালিকট নগরকে কামানের মুখে সমর্পণ করেন এবং প্রভূত সম্পত্তি লুণ্ঠন ও অগস্তি নরহত্যা ক'রে স্বদেশে ফিরে যান।

প্রথম ইমানুয়েল ছিলেন পর্ত্তুগালের রাজা। পর্ত্তুগীজরা তখন দক্ষিণ ভারতের একাধিক প্রত্যন্ত প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ভাস্কো-ডা-গামার দস্যুতা রাজার কাছে গৃহীত হ'ল বীরত্ব রূপে এবং পুরস্কার স্বরূপ ভাস্কো-ডা-গামা লাভ করলেন পর্ত্তুগালের ভারতীয় উপনিবেশের রাজ-প্রতিনিধিত্ব বা শাসনকর্ত্তৃত্ব। তিন মাস পরে দক্ষিণ ভারতেই (কোচিনে) তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতের সঙ্গে পর্ত্তুগালের ঐ সম্পর্কের ফলে তাড়াতাড়ি বড়লোক হবার লোভে দলে দলে পর্ত্তুগীজ এদেশে আসতে আরম্ভ করলে এবং অন্যান্য য়ুরোপীয়দের চেয়ে তারাই দলে ভারী হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে তারা বৈধ ও অবৈধ উপায়ে বাংলাদেশের স্থানে স্থানে আড্ডা গেড়ে কায়েমী হবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। প্রথমে তারা কুঠী স্থাপন করলে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে। তারপর আরো নানা জায়গায় তাদের আস্তানার সংখ্যা বেড়ে উঠতে লাগল ক্রমে ক্রমে।

ইংরেজরা যে বৈধ ভাবে বাংলাদেশে প্রধান হয়ে উঠেছিল, ইতিহাস এ কথা বলে না। পর্ত্তুগীজরাও গোড়া থেকেই এখানে প্রাধান্য বিস্তার করতে চেয়েছিল অবৈধ উপায়ে। কিন্তু তারা ছিল ইংরেজদেরও চেয়ে বেশী অসৎ। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তারা কোনরকম সঙ্কোচ বা ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারত না। দরকার হ'লেই তারা জলদস্যুতা করত বঙ্গোপসাগরের যেখানে-সেখানে। বাংলার বাসিন্দারা তাদের বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে পারে নি।

তার কারণও ছিল। পর্ত্তুগালের রাজা ভারতেও সুবৃহৎ উপনিবেশ স্থাপন করতে চেয়েছিল, কিন্তু রাজ্যবিস্তার করবার মত লোকবল তাঁর ছিল না, কারণ পর্ত্তুগাল হচ্ছে ক্ষুদ্র দেশ—ভারতবর্ষের বৃহৎ আসর জমাতে পারে, এমন যোগ্য ও শিষ্ট লোকের সংখ্যা সেখানে বেশী নয়।

যোগ্য লোকের অভাবে পর্ত্তুগালের কর্ত্তৃপক্ষ যে উপায় অবলম্বন করলেন, শেষ পর্য্যন্ত সেইটেই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের সর্ব্বনাশের কারণ।

পর্ত্তুগালের কারাগারে ছিল দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীগণ। তাদের বলা হ'ল, "তোমরা স্বদেশে ব'সে জেল খাটতে কিংবা ভারতবর্ষে গিয়ে স্বাধীনতার ভাগ্যপরীক্ষা করতে চাও?"

বলা বাহুল্য, কয়েদীরা ভারতবর্ষে যাওয়াই শ্রেয়স্কর ব'লে মনে করলে।

তাদের দলে ছিল গুরুতর অপরাধের জন্য দণ্ডিত অপরাধীরাও—কেউ খুনী, কেউ ডাকাত, কেউ গুণ্ডা। ভারতে তথা বাংলাদেশে গিয়েও তারা নিজেদের স্বভাব বদলাতে পারলে না, বরং দেশের সমাজ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে তাদের চক্ষুলজ্জা পর্য্যন্ত ঘুচে গেল। আর কয়লার ময়লাও যায় না।

তখন নানা দেশের য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীরা ভারত পর্য্যটন করতে আসতেন। তাঁদের ভ্রমণকাহিনীতে ভারতের পর্ত্তুগীজদের "বন্য মানুষ" এবং "পোষ-না-মানা ঘোড়া" ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের উপনিবেশে সুশাসনের গুণে পর্ত্তুগীজরা অপেক্ষাকৃত ভদ্রভাবে জীবনযাপন করতে বাধ্য হ'ত। এটা যাদের সহ্য হ'ত না, তারা সেখান থেকে স'রে প'ড়ে বাংলাদেশে গিয়ে পদার্পণ করত, কারণ বাংলার নদীতে নদীতে ছিল জলডাকাতি ক'রে রাতারাতি বড়লোক হবার সুযোগ।

চার

চতুর্দ্দিকে হাহাকার! ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদের অত্যাচার! সমাজ-সংসার উৎসন্নে যেতে বসল, বাংলায় গ্রামের পর গ্রাম শ্মশানের মত হয়ে উঠল।

ফিরিঙ্গীরা নদীতে নদীতে হানা দেয় এবং সুযোগ পেলেই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের য়ুরোপীয় জলদস্যুদের মত তীরে নেমেও লুটপাট করে, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, মানুষদের বন্দী ক'রে নিয়ে

যায়। দেখতে দেখতে তাদের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে বাসিন্দারা পলায়ন করতে লাগল—দেশ হয়ে উঠল অরাজক বা "ফিরিঙ্গীরাজক"।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" কাব্য নাকি ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত। তার মধ্যেও ঐ বোম্বেটে-বিভীষিকার প্রমাণ আছে। ধনপতি সওদাগর নদীতে নৌকো ভাসিয়ে চলেছেন—

"ফিরিঙ্গীর দেশ" খান বাহে কর্ণধারে,
রাত্রিতে বহিয়া যায় হরমাদের ডরে।"

"হরমাদ" মানে রণপোতবহর। পাছে ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদের দ্বারা আক্রান্ত হ'তে হয়, সেই আশঙ্কায় নৌকা চালানো হয়েছিল রাত্রির অন্ধকারে চুপে চুপে। আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, কবি মুকুন্দরাম ঐ অঞ্চলটিকে "ফিরিঙ্গীর দেশ" বলে বর্ণনা করেছেন। বাংলাদেশ তখন মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্গত এবং তার কয়েকটি প্রান্তে এমন কয়েকটি রাজ্য ছিল, যাদের স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন বলা চলত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অঞ্চলে তখন ফিরিঙ্গী পর্ত্তুগীজ জলডাকাতদের প্রাধান্য ছিল এত বেশী যে, তা কেবল "ফিরিঙ্গীর দেশ" ব'লেই বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু কেবল কি ফিরিঙ্গী? তাদের সহচর ছিল মগরাও। মগও ফিরিঙ্গী—দুষ্টামি ও নষ্টামিতে "কে হারে, কে জিনে, দুজনে সমান!" বাংলায় "মগের মুল্লুক" ব'লে একটা চলতি কথা আছে। মগের মুল্লুক—অর্থাৎ অরাজক দেশ। ফিরিঙ্গী এবং মগদের অত্যাচারে তখন বাংলাদেশের কতকাংশ সত্য সত্যই অরাজক হয়ে উঠেছিল।

আরাকান হচ্ছে ব্রহ্মদেশেরই একটা প্রদেশ। ত্রিপুরার দক্ষিণ দিক থেকে আরাকান রাজ্য আরম্ভ হয়েছে। মগরা হচ্ছে সেখানকারই বাসিন্দা। ধর্ম্মে বৌদ্ধ হলেও তারা অহিংসার মন্ত্র উচ্চারণ করত না।

এক সময়ে তারা বাংলাদেশও আক্রমণ ক'রে সমগ্র চট্টগ্রাম জেলা এবং নোয়াখালি আর ত্রিপুরারও কতক অংশ অধিকার করেছিল। এইজন্যে অবশেষে তাদের সঙ্গে মোগলদের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়।

কথায় বলে "চোরে চোরে মাসতুতো ভাই"। কাজেই ফিরিঙ্গী দস্যুদের সঙ্গে মগ দস্যুদের মিতালি হ'তে দেরি লাগল না। মগ ও ফিরিঙ্গীরা মনে মনে পরস্পরকে পছন্দ করত না, কিন্তু তারা এক জোট হয়েছিল কেবল একই স্বার্থের খাতিরে। মগদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দরকার হ'লে ফিরিঙ্গীরা মোগলদের সঙ্গে লড়াই করেছিল এবং আরাকানের দুই জায়গায় তাদের দুটো বড় বড় ঘাঁটিও ছিল বটে, কিন্তু তারা কোনদিনই সম্পূর্ণরূপে আরাকানরাজের বশ্যতা স্বীকার করে নি।

আসলে বাংলায় প্রবাসী ফিরিঙ্গী বা পর্ত্তুগীজরা ছিল জাতিভ্রষ্ট বা সমাজচ্যুত জীব। পর্ত্তুগাল তাদের স্বদেশ হ'লেও পর্ত্তুগালপতির বা তাঁর রাজপ্রতিনিধিরও কোন ধারই তারা ধারত না—মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছেলেদের মত যা খুসি তাই করতে পারত।

কিন্তু তারা ছিল নিপুণ নাবিক ও জলযুদ্ধে মহা ওস্তাদ। তাদের নৌকা বা জাহাজ ছিল রণপোতেরই নামান্তর, সর্ব্বদাই তার মধ্যে থাকত কামান, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। এইজন্যে বাংলার কয়েকজন বিদ্রোহী রাজা তাদের অনেককে বেতন দিয়ে নিজেদের দলে নিযুক্ত করতেন—যেমন শ্রীপুর ও বিক্রমপুরের রাজা চাঁদ রায় ও কেদার রায় এবং যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য।

চট্টগ্রামে ও আরাকানে ছিল পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেদের প্রধান আস্তানা। সাধারণতঃ তারা চট্টগ্রাম থেকে বেরিয়ে নদীপথে নৌবাহিনী চালিয়ে যখন তখন হানা দিত হুগলী, যশোহর, ভূষণা, বাক্‌লা, বিক্রমপুর, সোনারগাঁ ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানে। বলা বাহুল্য, তাদের পাপ কার্য্যের সঙ্গী হত মগের দলও এবং তারাও ছিল তাদেরই মত নিপুণ নাবিক।

শোনা যায়, এখন যেখানে হিংস্রজন্তুপূর্ণ, জনশূন্য সুন্দরবন, আগে সেখানে ছিল সব সমৃদ্ধিশালী জনপদ। কিন্তু দীর্ঘকাল ধ'রে মগ ও ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদের কবলে নির্য্যাতিত হয়ে নাগরিকরা ঘরবাড়ী ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিল।

পরিত্যক্ত, বিজন নগর আচ্ছন্ন হয়ে যায় ঝোপঝাপ আগাছায়, কালক্রমে বাড়ীঘরের ধ্বংসাবশেষের উপরে মাথা তুলে দাঁড়ায় মহা মহা মহীরুহ এবং চতুর্দ্দিকে নরনারীর কলকোলাহলের পরিবর্ত্তে শোনা যেতে থাকে ভয়াল জন্তুদের ভৈরব গর্জ্জন।

নাম হয় তার সুন্দরবন। সুন্দর বটে, কিন্তু ভীষণসুন্দর!

পাঁচ

"আরাকানী জলদস্যুরা (মগ ও ফিরিঙ্গী) নিয়মিত ভাবে বাংলাদেশ লুণ্ঠন করত। হিন্দু বা মুসলমান যাকে হাতের কাছে পেত, তাকেই তারা গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যেত।

বন্দীদের হাতের তেলোয় ছ্যাঁদা ক'রে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ত বেতের ফালি (বা রজ্জু), তারপর তাদের নিক্ষেপ করা হ'ত জাহাজের পাটাতনের তলায়। দিনের পর দিন তারা সেইখানে অন্ধকারে গাদাগাদি ক'রে বাস করত। প্রতিদিন সকালে তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে উপর থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ত কয়েক মুঠো আর্ঁধা চাউল—যেমন ক'রে লোকে ছড়িয়ে দেয় মুর্গীদের জন্যে।

ফিরিঙ্গীরা দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন বন্দরে গিয়ে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীদের কাছে বন্দীদের বিক্রয় ক'রে ফেলত। কিন্তু মগরা তা করত না, তারা স্বদেশে নিয়ে গিয়ে বন্দীদের নিযুক্ত করত কৃষিক্ষেত্রে বা গৃহস্থালীর কাজে।"

এই হল ঐতিহাসিকের উক্তি।

তমলুকের কিছুদূর থেকে গঙ্গার একটি শাখা চ'লে গিয়েছিল ঢাকা ও চট্টগ্রামের দিকে। এই জলপথ দিয়েই আনাগোনা করত মগ ও ফিরিঙ্গী দস্যুদল। ইংরেজ বণিকরা ঐ জলপথের নাম দিয়েছিল, "দুরাত্মাদের নদী"।

আগেই য়ুরোপীয় সমুদ্রে মূর জলদস্যুদের কথা বলা হয়েছে। বন্দীদের তারা এখানে ওখানে নিয়ে গিয়ে বিক্রী ক'রে ফেলত।

লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে তারা চালাত দাসব্যবসায়। খুব সম্ভব তাদের দেখাদেখি বাংলাদেশের ফিরিঙ্গী বোম্বেটেরাও ঐ পেশা অবলম্বন করেছিল।

ভেবে দেখ, সে কি নিদারুণ ব্যাপার! চারিদিকে অখণ্ড শান্তি, নদীর ধারে ঘুমিয়ে আছে সবুজ বাংলার গ্রাম্য প্রকৃতি। সোনার ধান দোলানো ক্ষেতের আশেপাশে মাঠে মাঠে নির্ভয়ে খেলা করছে গৃহস্থদের শিশুরদল—তাদের কারুর নাম রাম বা শ্যাম কিংবা কাসেম বা কাদের।

আচম্বিতে দিকে দিকে হৈ-চৈ উঠল—"ওরে, পালা, পালা!" "ফিরিঙ্গীরা আসছে, বোম্বেটেরা আসছে!"

নদীর ধারে হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ল বোম্বেটেদের জাহাজ এবং তার ভিতর থেকে টপাটপ লাফিয়ে পড়ল মূর্ত্তিমান যমদূতের মত পর্ত্তুগীজ গোরার দল!

ছেলের দল খেলা ভুলে প্রাণপণে দৌড় মারলে যে যেদিকে পারে। কিন্তু সবাই পালাতে পারলে না, ধরা পড়ল অনেকেই।

তারপর? ফিরিঙ্গী বোম্বেটেরা তাদের নিয়ে গিয়ে বেচে ফেললে ইংরেজ, ফরাসী বা ওলন্দাজ বণিকদের কাছে। ক্রীতদাস নিয়ে তারা ফিরে গেল সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আপন আপন দেশে।

বাংলাদেশের কচি কচি শ্যামলা ছেলে, যেখানে গিয়ে পড়ল

সেখানকার মানুষ, ভাষা, তুষারপাত ও জীবনযাত্রা—সবই তাদের কাছে নূতন, আজব, দুর্বোধ! কোথায় আদরভরা মা-বাপের কোল আর কোথায় অজানা বিদেশীদের কাছে যন্ত্রণাপূর্ণ ক্রীতদাসের জীবন। ছিল সবাই আনন্দময় ফুলের বাগানে, গিয়ে পড়ল নির্জল, নির্ম্মম মরুভূমিতে।

ম্যাডাম দ্যু বেরী ছিলেন ফরাসীদেশের এক পরমাসুন্দরী বিলাসিনী, রাজা পঞ্চদশ লুইর প্রিয়-বান্ধবী। এমনি এক বাংলার ছেলে গিয়ে পড়েছিল তাঁর কাছে, তিনি তাকে সখ ক'রে দামী দামী পোষাক পরিয়ে লালনপালন করতেন—মানুষ যেমন ক'রে পাখী পোষে সোনার খাঁচায়। তার বাঙালী বাপ-মা কি নাম ধ'রে তাকে ডাকতেন কেউ তা জানে না, কিন্তু ফরাসী দেশে সবাই তাকে জামোর ব'লে ডাকত।

জামোর কি খুসি ছিল? মোটেই নয়, মোটেই নয়! স্বাধীন পাখী কি সোনার খাঁচায় খুসি থাকতে পারে? জামোর জানত, সবাই তাকে বলে "বিকটাকার ক্ষুদে জন্তু"! বুকের তলায় প্রাণ তার বিদ্রোহী হয়ে উঠত।

অবশেষে সে প্রতিশোধ নিলে। সুরু হ'ল ফরাসী বিপ্লব, রাজা পঞ্চদশ লুইর প্রিয়পাত্রী ও জামোরের কর্ত্রী দ্যু-মেরী হ'ল বন্দিনী।

বিচারালয়ে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে জামোর। দ্যু বেরীর উপরে হ'ল প্রাণদণ্ড।

পূর্ব্ববাংলায় মগরাও করত ফিরিঙ্গীদের মত অমানুষিক অত্যাচার। মুসলমান ঐতিহাসিক তাদের সম্বন্ধে বলেছেন:

"বাংলার সীমান্তপ্রদেশে মগদের অত্যাচারে আকাশে উড়ত না একটা পাখী, স্থলে বিচরণ করত না একটা জন্তু। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্য্যন্ত যাতায়াত করবার পথের দুই পাশে দেখতে পাওয়া যেত না এক জনমাত্র গৃহস্থকেও।"

এমন অস্বাভাবিক অবস্থা কল্পনাও করা যায় না। এবং এমন অস্বাভাবিক অবস্থা চিরদিন কখনো স্থায়ী হ'তেও পারে না। অবশেষে মোগলসম্রাট ও মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের টনক নড়ল। প্রথমে তাঁরা ব্যাপারটার গুরুত্ব না বুঝে দুই-চারিদল সেপাই পাঠিয়ে বোম্বেটেদের দমন করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বোম্বেটেরা অনায়াসেই তাদের হারিয়ে দিলে। তখন তাঁরা দস্তুরমত আয়োজন ক'রে কোমর বেঁধে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

ছয়

১৬৩২ খৃষ্টাব্দের কথা

সর্ব্বপ্রথমে ভারত সম্রাট সাজাহানের দৃষ্টি পড়ল হুগলীর পর্ত্তুগীজ উপনিবেশের উপরে। তাঁর আজ্ঞায় সেনাপতি কাসিম খাঁ সসৈন্যে যাত্রা করলেন হুগলীর দিকে।

বাংলার মধ্যে হুগলীতেই পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ ছিল সব চেয়ে সুপরিচালিত, সুরক্ষিত ও সুবৃহৎ। সেখানকার পর্ত্তুগীজদের অধিকাংশই জলদস্যু ছিল না বটে, কিন্তু তারা মোগলদের শত্রু আরাকানরাজকে সৈনিক ও গোলা-বারুদ প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করত। উপরন্তু বাংলার ফিরিঙ্গী বোম্বেটেরা হুগলীতে এসে ফলাও ভাবে দাস-ব্যবসায় চালিয়ে যেত। তাঁর অভাগা প্রজাদের বন্দী করে ফিরিঙ্গীরা যে হাটে নিয়ে গিয়ে গরু-ছাগলের মত বিক্রী ক'রে ফেলবে, সম্রাট সাজাহানের পক্ষে এটা অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

মোগলরা যে সৈন্যবলে ছিল অধিকতর বলীয়ান, সে কথা বলাই বাহুল্য। আগে জলস্থলের চারিদিক থেকে হুগলীকে ঘিরে ফেলে তারা আক্রমণ করতে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু পর্ত্তুগীজদের যুদ্ধপ্রতিভা

ছিল অসামান্য, সংখ্যায় দুর্ব্বল হ'লেও তারা দীর্ঘ তিন মাস ধ'রে মোগলদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলে। অবশেষে তারা গঙ্গায় জাহাজ ভাসিয়ে যুদ্ধ করতে করতে কতক পলায়ন করলে। কতক মারা পড়ল এবং কতক বন্দী হ'ল। মোগলসম্রাট উপহার লাভ করলেন চারিশত বন্দী ফিরিঙ্গী নরনারী। এই ভাবে পশ্চিম বাংলায় হুগলী বন্দরে পর্ত্তুগীজদের প্রধান আস্তানা বিলুপ্ত হয়।

কিন্তু এর আগে এবং এর পরে অনেক কাল ধ'রেই পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাংলায় ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদের প্রভাব বা অত্যাচার ছিল অপ্রতিহত। তারা নিষ্ঠুর ও দস্যু ছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে কোনদিনই তাদের সাহস ও বারত্বের অভাব হয় নি। মোগলদের সঙ্গেও তারা লড়াই করেছে, মগদের সঙ্গে বিবাদ বাধলেও তারা অস্ত্র ধরেছে এবং জয়ী হয়েছেও বারংবার।

তাদের মধ্যে দুইজন নেতার নাম বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ডোমিঙ্গো কার্ভালহো ও সিবাষ্টিয়ো গঞ্জেলেশ।

কার্ভালহো শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের অধীনে কাজ করত। সে মগদের কবল থেকে সনদ্বীপ কেড়ে নিয়ে কেদার রায়ের হাতে সমর্পণ করেছিল। এবং কেদার রায়ের রাজধানী মোগলদের দ্বারা আক্রান্ত হ'লে কার্ভালহোই তাদের হারিয়ে শ্রীপুরকে রক্ষা করে। পরে রাজা প্রতাপাদিত্যের আদেশে সে নিহত হয়।

গঞ্জেলেশ ছিল একের নম্বরের দুরাত্মা। তার নেতা হবার উপযুক্ত বিশিষ্ট গুণ থাকলেও দস্যুতায় নৃশংসতায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় তার তুলনা ছিল না। বাক্‌লার বাঙালী রাজার কাছ থেকে সৈন্যসাহায্য পেয়ে সে মুসলমানদের হারিয়ে সনদ্বীপ অধিকার করে, অথচ পরে ঐ রাজাকেই বঞ্চিত করে নিজেই সেখানে প্রভু হয়ে ব'সে শাসনকার্য্য চালাতে থাকে। কিন্তু গঞ্জেলেশের ক্রূরতা ও কঠিন স্বভাবের জন্যে তার

অধীনস্থ অন্যান্য ফিরিঙ্গী বোম্বেটেরা পর্য্যন্ত তাকে তু-চক্ষে দেখতে পারত না। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে আরাকানের রাজা তার কাছ থেকে সনদ্বীপ কেড়ে নেন এবং গঞ্জেলেশের নামও ডুবে যায় বিস্মৃতির অন্ধকারে!

শেষের দিকে মগদের সঙ্গে ফিরিঙ্গীদের আর বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। তুই জাতির মধ্যে প্রায়ই খিটিমিটি বাধতে থাকে। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের বিখ্যাত শাসনকর্ত্তা শায়েস্তা খাঁ যখন সনদ্বীপ দখল ক'রে চট্টগ্রাম আক্রমণের উদ্যোগ করছিলেন, সেই সময়ে মগেদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ফিরিঙ্গীরা তাঁর ফৌজে যোগ দেয় সদলবলে। সেই সম্মিলিত মোগল ও ফিরিঙ্গী সৈন্যদের আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে না পেরে আরাকানীরা সে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল এবং অবশেষে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হ'ল মগের মুল্লুক। সেখানে বন্দীদশায় জীবনযাপন করছিল হাজার হাজার বাঙালী কৃষক। স্বাধীনতা পেয়ে ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে এল।

প্রথমে হুগলী এবং তারপর চট্টগ্রাম—এই তুই প্রধান বন্দর ও আস্তানা থেকে বঞ্চিত হয়ে বোম্বেটেদের মেরুদণ্ড একেবারেই ভেঙে গেল। মগরা আর বাংলার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে নি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষের দিকেও বাংলাদেশে পর্ত্তুগীজরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল বটে, কিন্তু তাদের অবস্থা হয়ে পড়েছিল বিষদাঁতভাঙা ভুজঙ্গের মত।

বোম্বেটেদের হাতে ইংরেজদের নাকাল হ'তে হয় নি। তারা এখানে কায়েমী হয়ে বসবার আগেই বাংলাদেশ থেকে বোম্বেটেরাজ বিলুপ্ত হয়েছে।